التوحيد

আত্-তাওহীদ

مجلة شهرية أدبية اسلامية

تصدرها الجامعة الإسلامية فتية شيتاغونغ

নভেম্বর'১৩

মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের সংকট ও সম্ভাবনা

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার

শ্রুতিমধুর ঈমান-বিধ্বংসী থিউরি

প্রিন্স আগা খান ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় সম্পদের পাহাড় যাদের দখলে

উপজাতিরা নয়, বাঙালিরাই আদিবাসী

Believe & Trust Business Ltd

Honesty is the best Policy

TAHA BUILDERS LTD.

Success Lend by Work

Corporate Office : M J Tower (6th floor), House # 171, Road # 2-Kha, Sugandha R/A, Chittagong, Tel: 031 255 8271, Fax: 031 255 8272

Sylhet Office : Habib Bhaban (3rd floor), Dupadeghee Purba Par, Naiurpole, Sylhet, Tel: 0821 728578

E-mail: btblbd@yahoo.com, tahabl.ltd@gmail.com, Web: www.btblbd.page4.me, www.tahabl-bd.com

হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন

প্রোপ্রাইটর

মক্কা এম্পোরিয়াম

MAKKAH EMPORIUM

দেশী-বিদেশী উন্নতমানের সার্টিং, স্যুটিং, ব্লেজার, স্যুট পিচ, পাঞ্জাবী, কাবুলী, জুব্বা, সেরোয়ানী ও বোরকার কাপড়সহ ইউনিফর্ম ও এহরামের কাপড়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন)
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২৮৬১০০১
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১
০১৮১৯-৯৩১৪১৫

باسمه تعالى

مدرسة عثمان بن عفان رضي الله عنه شيتاغونغ

মাদ্‌রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা.) চট্টগ্রাম

স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মুতা. ২০০৩ ইং

[দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান]

প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাপ্রণালী ও বিভাগ সমূহঃ

★ হাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স

- অত্র বিভাগে কওমী মাদ্‌রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত সিলেবাস দ্বারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া (কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, নাহু, ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়।
- প্রথম বছরের ইব্‌তেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়।
- অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়।

★ হিফজ বিভাগ

- মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদেরকে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজভীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে মুখস্থ করানো হয়।
- কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্বামত, পাক-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- আরবী, বাংলা, অংক ও ইংরেজীসহ থ্রী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

★ নূরানী কিন্ডার গার্টেন

- মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা হয়।
- হিফজ নাজারা ও হিফজ বিভাগে যাওয়ার জন্য পুর্ণ প্রস্তুত করা হয়।
- যাবতীয় দু'আ কালেমা ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। প্লে/নার্সারী হতে কেজি টু পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়।

* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে ছষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

আবাসিক **অনাবাসিক** **ডে-কেয়ার**

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পিতৃস্নেহে শিক্ষাদান।
- রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন।
- দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
- ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা।
- ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রণ করাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা।

ভর্তি চলছে

আসন সংখ্যা সীমিত

প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয়।

বাড়ী # ১৭২, রোড # ৮, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম। ফোন : ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫

নিয়মিত প্রকাশনার ৪৩ বছর

প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, যুল হজ'৩৪–মুহাররম'৩৫ = নভেম্বর'১৩

আত-তাওহীদ

ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

প্র তি ষ্ঠা তা

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.)

প্র ধা ন স ম্পা দ ক

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী

স ম্পা দ ক

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

স হ কা রী স ম্পা দ ক

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ

যো গা যো গ

আততাওহীদ

সম্পাদনা দফতর

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম–৪০০০

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক), ০১৮১৯–৩৫৩৮৯৬ (দফতর সম্পাদক), ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার)

fb/monthlyattawheed

ই-মেইল: monthlyattawheed@gmail.com

drkhalid09@gmail.com (সম্পাদক)

www.monthlyattawheed.com

ব্য ব স্থা প না য়

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

দাম: পনের টাকা মাত্র

Monthly At-tawheed

A monthly journal for Islamic research and literary affairs published by Al-Jamia Al-Islamia, Patiya, Chittagong, from Magazine Complex,Al-Jamiah Market (2nd Floor), 160, Anderkillah, Chittagong-4000, Bangladesh.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ০৩

সমকালীন ❑

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার
— মুফতি ইউসুফ সুলতান ০৪

উপজাতিরা নয়, বাঙালিরাই আদিবাসী
— প্রফেসর ড. আবদুর রব ০৬

প্রিন্স আগা খান ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়
— নজরুল ইসলাম টিপু ১৩

মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের সংকট ও সম্ভাবনা
— খান শরীফুজ্জামান ২০

ধর্ম-দর্শন ❑

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায
— মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ২৪

কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ধর্মীয় কাজের বিনিময়
— আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ২৭

মহাজীবন ❑

আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ
— ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ৩০

দাওয়াত ❑

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা
— ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার ৩৩

ডা. মরিস বুকাইলি: যেভাবে মুসলিম হলেন ৩৫

আলোর পথে ❑

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ
— মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩৭

বিশ্বসাহিত্য ❑

মহানবী ﷺ-এর শত মুজিযা
— কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী ৪১

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ❑

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব–৮
— খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৪২

সম্পাদকীয়

আশুরাঃ
ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা

মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে 'আশুরা' নামে অভিহিত। প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট 'আশুরা' পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ। ইহূদীদের নিকট 'আশুরা' জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত। আশুরার মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত। মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে। আশুরার দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ মহাপ্লাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক ইহূদীদের উদ্ধার, দূরারোগ্য ব্যাধি হতে হযরত আয়ূব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিস্কৃতি, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্রাপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসূফ (আ.)-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলন, কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতসহ বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী 'আশুরা' *(মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬)*।

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, ইহুদীরা 'আশুরা' দিবসে রোযা রাখছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী। অতঃপর রাসূলুলল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন' *(সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯)*।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত রাসূলুলল্লাহ (সা.) বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা'র রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ' *(জামে তিরমিযী ১/১৫৬)*। পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "আমি আশা করি যে ব্যক্তি আশুরা দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে' *(মুসলিম, ১/৩৬৭)*। আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন *(মুসনাদ আহমদ)*।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) মর্মান্তিক শাহাদাত আশুরাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। খিলাফত ব্যবস্থার পুনরোজ্জীবন ছিল হযরত হোসাইন (রা.)-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। হযরত হোসাইন (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল বীরত্বপূর্ণ। মদীনার পরিবর্তে দামিস্কে রাজধানী স্থানান্তর, উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সর্বোপরি ইহূদী আবদুললাহ ইব্ন সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকান্ডের জন্ম দেয়। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন (রা.) স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তাঁকে বাধা প্রদান করে। রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তাঁকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুর্কী সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিস্কে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন। হযরত হোসাইন (রা.) ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয়। হযরত হোসাইন (রা.)-এর শিবিরে পানির হাহাকার উঠে। তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য। ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন। ইমাম হোসাইন (রা.) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন। ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক বর্ষা ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয়। ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায় *(আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)*।

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর। এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে। কারবালার শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ করেননি। তাঁর এ শাহাদত গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। তাই আশুরা মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

স । ম । কা । লী । ন

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার

শ্রুতিমধুর ঈমান-বিধ্বংসী থিউরি

মুফতি ইউসুফ সুলতান

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার—বাক্যটা শ্রুতিমধুর তবে ঈমান বিধ্বংসী। যেসব উৎসবের মূল ধর্মীয় আচার বা বিশ্বাস, সেগুলো সেই ধর্মাবলম্বীর সাথেই বিশিষ্ট। অন্য ধর্মের কেউ তা পালন করলে স্বধর্ম ছেড়ে আসতে হবে।

একজন হিন্দু কখনো মুসলিমের সাথে আল্লাহর নামে কুরবানীতে অংশ নিতে পারে না। নিলে সে আর হিন্দু থাকে না। মুসলিম হয়েই পরে অংশ নেয়।

আবার একজন মুসলিম পূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইলে তাকে ইসলাম ত্যাগ করে যোগ দিতে হয়। ইসলামের গণ্ডির ভেতর থেকে পূজায় অংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের মূল বক্তব্য হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। আর পূজায় তা বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করা হয়।

গত কয়েকদিন আগে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এসএমএস আসল। May Maa bless you with happiness all the year through… বাকি অংশে পূজার শুভেচ্ছা জানানো হল। এসএমএসটি কয়েক ধাক্কায় পড়তে পারলাম। May Maa bless you এমন ব্যবহার কখনো করি নি, কোথাও করতে শুনিওনি। প্রথম কয়েকবারই মনে হচ্ছিল, কী যেন একটা ভুল হয়েছে এসএমএসটিতে। পরে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, 'এটা ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' থিওরির প্রসব-কৃত।

ইসলামে Maa-এর Bless করার কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র Bless-কারী আল্লাহ তায়ালা। জীবন-মৃত্যু, রিযিকে প্রশস্ততা-সংকট, সুস্থতা-অসুস্থতা সবই তাঁর একক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তিনি এক ও একমাত্র, তাঁর সমকক্ষ তো দূরের কথা, ধারে-কাছেও কেউ নেই।

ইসলামে মা-বাবা, স্বামী-বস, শিক্ষক ইত্যাদি কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সবাই সাধারণ মানুষ। তাই তো তাদের পূজা করা বা বিশেষ সম্মানে তাদের সামনে নত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আল-কুরআন ও সুন্নায় স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্বাচিত শব্দ زوج। এর অর্থ 'জোড়া'। এক জোড়া মোজার মধ্যে কোনটির সম্মান বেশি, বলা যায় কি? ইসলামে স্বামী স্ত্রীর অবস্থা ঠিক একই রকম। উভয়ে একে অপরের সমান সঙ্গী। এক জোড়া মোজার একটিকে বাদ দিলে অপরটির কোনো মূল্য নেই। স্বামী-স্ত্রীও তেমন। তবে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরুষ দায়িত্বশীল, পরিবারের খাদিম সে।

যা হোক, পূজায় অংশ নিলে ইসলামের এই একত্ববাদের বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে। একই সাথে হ্যাঁ-না বা এক-দুই একত্রিত হতে পারে না। হয় হ্যাঁ নয় না, হয় এক নয় দুই। মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই, কোনো সেফ জোন নেই, দুই দেশের সীমানার মাঝের জায়গার মতো।

অনুরূপভাবে পূজার শুভেচ্ছা জানানোরও কোনো সুযোগ নেই। কারণ শুভেচ্ছা হলো কল্যাণ কামনা করা। অর্থাৎ পূজা যেন ঠিক মত হয় সে কামনা-প্রার্থনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে যেন, তাঁর সাথে কৃত শিরক ঠিক মত সম্পন্ন করা যায়। কত বড় ভয়ানক বিষয়!

তবে হ্যাঁ, একজন মুসলিম অন্য ধর্মের উপাসনা, তাদের উপাসনালয় ও তাদের ধর্মকে কটাক্ষ করা, ইত্যাদি থেকে সবসময় বিরত থাকবে। [আরো পড়ুন: http://yousufsultan.com/islam-against-torture-on-non-muslims/]

একজন মুসলিম সবসময়ই সচেষ্ট হবেন, তাঁর আখলাক দিয়ে, তাঁর অমুসলিম ভাইকে, ইসলামের দিকে আহ্বান করতে। কুরবানী কেন করা হয়, এ বিষয়টি তাকে বোঝানো যেতে পারে। তাকে কুরবানীর গোশত দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে যদি তিনি প্রতিবেশী-আত্মীয় বা গরীব হন এবং কোনো ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত না হন।

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِيْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا

الْيَهُوْدِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِينِيْ بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর একটি বকরী যবেহ করা হলো। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে কি দিয়েছ? আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে কি দিয়েছ? আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বলেছে যে, আমার মনে হয়েছে যে, তাকে উত্তরাধিকারও বানানো হবে।'[১]

(তবে ওয়াজিব কুরবানীর গোশত মুসলিমদের মাঝেই বণ্টন করা উচিৎ। কারণ এটি একটি ইবাদাত)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমানের ওপর অটল রাখুন। আমীন।

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১৯৪৩

সুখবর সুখবর সুখবর

সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস)

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে

B.B.A.	M.B.A./E.M.B.A.
L.L.B. (Hno's), Pass & L.L.M.	B.A. (Hno's) & M.A. in English Literature
Diploma & M.A. in Library Science	B.A. (Hno's) & M.A. in Islamic Studies
B.Ed (Pass)	M.Ed

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

চট্টগ্রাম

হাই # ৬, রোড # ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯

কক্সবাজার

আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার। ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫

কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়।

আপনার সন্তান কি মাদকাসক্ত?

সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

হলি লাইফ

(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র)

৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা

ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২

স । ম । কা । লী । ন

উপজাতিরা নয়, বাঙালিরাই আদিবাসী

প্রফেসর ড. আবদুর রব

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভূরাজনীতি বিশ্লেষক প্রফেসর ড, আবদুর রব বলেছেন, এদেশে ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী উপজাতীয় জাতিসত্তাগুলো আমাদেরই অংশ, বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশি । এদেশের সম্পদে-সম্মানে, বিপদে-সুদিনে, সমৃদ্ধিতে-সৌহার্দ্যে সবকিছুতেই তাদের রয়েছে সমান অধিকার । কিন্তু তারা কোনোক্রমেই এদেশের আদিবাসী হতে পারে না । এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভুল তত্ত্ব । এদেশের অকাট-মূর্খ পণ্ডিতদের (জ্ঞানপাপী) জানিয়ে দেওয়া উচিত, কারা উপজাতি (Tribals) আর কারা আদিবাসী (Aboriginals) আর একই সঙ্গে তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারী বিদেশি আদিবাসী শক্তির এজেন্ট এনজিও চক্রকেও আদিবাসী উপজাতীয় বির্তক না ছড়াতে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত । এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও মাত্র কিছুদিন পূর্বে এসব জাতিতাত্ত্বিক বিভাজন বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দেওয়ার জন্য অনেকগুলো খ্রিস্টবাদী এনজিও চক্রকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে ভারতীয় সরকার । প্রফেসর ড, আবদুর রব-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হল ।

প্রশ্ন: আদিবাসী ও উপজাতি বিতর্কের কারণ কি?

প্রফেসর ড. আবদুর রব: উপজাতি এবং আদিবাসী । আদিবাসী বলতে ইংরেজিতে Aboriginals বা Indigenous People-ও বলে । উপজাতি হলো Tribe এটা উপনিবেশিক শব্দ । আমাদের দেশে বাঙালি মূলধারার বাইরে যারা আছে তারা আদিবাসী নয় । তাদের আমরা উপজাতি বলতেও নারাজ । বরং তাদেরকে বলা যেতে পারে বঃযহরপ বা নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ।

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় আদিবাসী বা এবোরিজিন্যালসরা হচ্ছে, কোনো অঞ্চলের আদি ও অকৃত্রিম ভূমিপুত্র বা Son of the soil । প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গানের সংজ্ঞানুযায়ী আদিবাসী হচ্ছে, 'কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই ।' মর্গান বলেন, The Aboriginals are the groups of human race who have been residing in a place from time immemorial … they are the true Sons of the soil….[1]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খর্বাকৃতির স্ফীত চ্যাপ্টা নাক কুঁকড়ানো কেশবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের বুমেরাংম্যানরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বা যথার্থ এবোরিজিন্যালস । তারা ওখানকার ভূমিপুত্রও বটে । ঠিক একইভাবে মাউরি নামের সংখ্যালঘু পশ্চাৎপদ প্রকৃতিপূজারী নিউজিল্যান্ডের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সেখানকার আদিবাসী । আমেরিকার বিভিন্ন নামের মঙ্গোলীয় ধারার প্রাচীন জনগোষ্ঠী যাদেরকে ভুলক্রমে রেড ইন্ডিয়ান (উত্তর আমেরিকা) বলা হয় এবং সেন্ট্রাল আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকা, আজটেক, মায়ান, আমাজানসহ আরো অসংখ্য ক্ষুদ্র বিলুপ্ত কিংবা সঙ্কটাপন্ন (Extinct or Endangered Groups) জনগোষ্ঠীকে সঠিক এবোরিজিন্যালস বলে চিহ্নিত করা

যায়। তথাকথিত সভ্য সাদা, ইউরোপীয় নতুন বসতি স্থাপনকারী অভিবাসীরা (A New Settlers and Immegrants) ওইসব মহাদেশের আদিবাসীদের নির্মম বিদ্বেষ, হিংস্র প্রবঞ্চনা, লোভ আর স্বার্থপর আগ্রাসনের দ্বারা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডসহ অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সেন্ট্রাল ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ, স্প্যানিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ প্রভৃতি উপনিবেশবাদী শক্তি বিগত ৩/৪টি শতক ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে জাতিগত নির্মূল তৎপরতার মাধ্যমে (Ethnical Cleansing) এসব মুক্ত স্বাধীন আমেরিকান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে পৃথিবী থেকে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছে। আজ ঐ শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলীয় এবং ইউরোপীয় তথাকথিত সুশিক্ষিত, ধ্বজাধারী সাবেক উপনিবেশবাদীদের নব্য প্রতিনিধিরা তাদের নব্য উপনিবেশবাদী অর্থাৎ তথাকথিত মুক্ত অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের জন্য আদিবাসী সংরক্ষণ (Conservation of Aboriginal)-এর ধুয়া তুলে তাদের অর্থের মদদপুষ্ট এনজিও এবং মিশনারি চক্রের সুনিপুণ প্রচারণায় ও ষড়যন্ত্রে উপজাতিগুলোর জন্য মায়াকান্না শুরু করেছে। আরম্ভ করেছে ভয়ানক সূক্ষ্ম সম্প্রসারণবাদী ষড়যন্ত্র আর আধিপত্যবাদী চাণক্য চাল।

এসব উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর এই মায়াকান্নার পেছনে মূলত ভূ-রাজনৈতিক, সামরিক, ভূ-অর্থনীতিক এবং সর্বোপরি আধিপত্যবাদী স্বার্থই প্রবলভাবে কাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত আদিবাসীদের তারা যেখানে গণহত্যা, জাতিগত নির্মূলসাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানে তারা এখন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সম্ভাবনাময় স্বাধীনচেতা উঠতি শক্তি– বিশেষ করে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে এসব উপজাতি (Tribals) ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতিসত্তার বিকাশ, আদিবাসী সংরক্ষণ ইত্যাদির কথা বলে ভাষাগত, বর্ণগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক বিভাজন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রেক্ষাপট তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঐ হীন চক্রান্তের ফলশ্রুতিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ইত্যাদি এককালীন ঔপনিবেশিক শক্তিদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাবহ জাতিসংঘের (ইউএনও) সহযোগিতায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার যৌক্তিক সার্বভৌম অঞ্চল তিমুর দ্বীপের পূর্বাঞ্চলকে (ইস্ট-তিমুর) বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ইস্ট-তিমুরের এই বিচ্ছিন্নতার পেছনে আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র কাজ করেছে এবং এখানেও আদিবাসী, উপজাতি ইত্যাদি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে সর্বনাশা খ্রিস্টবাদী এনজিও চক্র, মিশনারি গ্রুপ এবং তথাকথিত মানবাধিকার সংরক্ষণ (Human Rights Activists) চক্র। এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্র (Emerging Tiger of Asia) ২০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার তিমুর দ্বীপের কাছের দক্ষিণেই হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত অস্ট্রেলিয়াসহ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং অস্ট্রেলিয়া এই কৌশলগত ও অবস্থানগত দুর্বলতাকে চিরতরে দূর করাতেই খ্রিস্টবাদী পরাশক্তিসমূহ জাতিসংঘকে ব্যবহার করে অত্যন্ত সুকৌশলে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন করে দেয়। আর ওই একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশেও একই খ্রিস্টবাদী সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের আধিপত্যবাদী ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থকে (Geo-Political and Strategical Interests) সংরক্ষণ ও চরিতার্থ করার জন্য তাদের সেই কৌশলকে বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছে। এ জন্য তারা বেছে নিয়েছে দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, মগসহ বিভিন্ন বসতি স্থাপনকারী উপজাতীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে। একই সাথে এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও তাদের অর্থপুষ্ট এনজিও চক্র বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন– সিলেটের খাসিয়া, মণিপুরী, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের গারো, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুরের বনাঞ্চলের কুচ রাজবংশীয় বহিরাগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে এদেশের আদিবাসী বলে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাতে শুরু করেছে এবং এর মাধ্যমে এদের এসব সংশ্লিষ্ট বৃহদায়তনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভূমিপুত্র (Son of the Soil) বলে প্রতিষ্ঠিত করার এক হীন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত যে বাংলাদেশে বসবাসরত কোনো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী নয়। বরং তারা পার্শ্ববর্তী কিংবা বিভিন্ন দূরবর্তী স্থান থেকে দেশান্তরী হয়ে এদেশের নানা স্থানে অভিবাসিত হয়ে ক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করে আসছে। কিন্তু কোনোক্রমেই বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসিয়া কিংবা কুচ রাজবংশীয় সাঁওতালরা এদেশের আদিবাসী হতে পারে না।

প্রশ্নঃ তাহলে বাংলাদেশে আদিবাসী কারা?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষীরা। কারণ তারাই প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto Astroloid) নামের আদি জনধারার অংশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর

তারাই একমাত্র আদিবাসী এবং Son of the Soil বলে দাবি করতে পারে। এর পেছনে অনেক জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণও রয়েছে। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড ধারার বাঙালি নামের বাংলাদেশের এই আদিবাসীরা যদিও একটি মিশ্র বা শংকর জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত সেখানে ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক জাতিধারার সাথে ভেড্ডাইট, নিগ্রোয়েড, দ্রাবিড়ীয় এবং অন্যান্য বহু জানা-অজানা আদি জনধারার সংমিশ্রণ ও নৃতাত্ত্বিক মিথষ্ক্রিয়া সাধিত হয়েছে। তবুও যেহেতু এসব জনগোষ্ঠীর এদেশে সুস্পষ্ট অস্তিত্বের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে অনুদ্ঘাটিত ও অজানা এবং স্মরণাতীতকালের হাজার হাজার বছর আগে থেকে এদের পূর্বপুরুষরা এই নদীবিধৌত পলল সমভূমিতে এসে বসতি স্থাপন করেছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র তাদেরকে অর্থাৎ বাঙালিরাই Son of the Soil বা আদিবাসী বলা যায়। বিশ্বের তাবৎ শীর্ষস্থানীয় নৃবিজ্ঞানী এবং গবেষকবৃন্দই এ ব্যাপারে একমত।

প্রশ্নঃ এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো যে আদিবাসী নয় এর প্রমাণ কি?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ বাংলাদেশের উপজাতীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো এদেশের আদিবাসী বা ভূমিপুত্র নয়– তার প্রমাণ প্রখ্যাত উপজাতি গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদ RHS Huchinson (১৯০৬) T H Lewin (১৮৬৯), অমেরেন্দ্র লাল খিসা (১৯৯৬), J. Jaffa (১৯৮৯) এবং N Ahmed (১৯৫৯) প্রমুখের লেখা, গবেষণাপত্র, থিসিস এবং রিপোর্ট বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। তারা সবাই একবাক্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের নিকট অতীতের কয়েক দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এদেশে স্থানান্তরিত হয়ে অভিবাসিত হবার যুক্তি-প্রমাণ ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন। খোদ চাকমা পণ্ডিত অমেরেন্দ্র লাল খিসা অরিজিনস অব চাকমা পিপলস অব হিলট্রেক্ট চিটাগংএ লিখেছেন, 'তারা এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে পরবর্তীতে আরাকান এলাকায় এবং মগ কর্তৃক তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ করেন। আজ থেকে আড়াইশ তিনশ; বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর দিকে রাঙামাটি এলাকায়।' এর প্রমাণ ১৯৬৬ বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত দি অরিয়েন্টাল জিওগ্রাফার জার্নাল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় শ্রেণীভুক্ত। একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা বসবাস করে আসছে। তবে জনবসতি কম হওয়ায় বিভিন্ন ঘটনার বা পরিস্থিতির কারণে আশপাশের দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজন এসে বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি জাতি বহির্ভূত অন্য সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি স্থাপনকারী। এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং, পাংখো এবং কুকিরা মূল কুকি উপজাতির ধারাভুক্ত। ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ থেকে ৫শ বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আগমন করে। চাকমারা আজ থেকে মাত্র দেড়শ থেকে ৩শ বছর পূর্বে মোগল শাসনামলের শেষ থেকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে মায়ানমার আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে (Lewin 1869)। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং ব্রিটিশ প্রশাসক টি. এইচ. লেউইনের মতে, A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hill Tracts undoubtedly come about two generations ago from Aracan. This is asserted both by their own traditions and by records in Chittagong Collectorate.[2] পার্বত্য অঞ্চলের মারমা বা মগ জনগোষ্ঠী ১৭৮৪ সনে এ অঞ্চলে দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে।[৩] এরা ধর্মে বৌদ্ধ মতাবলম্বী। এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত। যেমন– জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী মারমা।

ব্যোমরা মায়ানমার-চীন পর্বত থেকে নিয়ে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে। খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতার ফলে এদের অধিকাংশই বর্তমানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। লুসাইরাও এখন অধিকাংশই খ্রিস্টান। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য একটি বড় জনগোষ্ঠী মুরং। এদের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত প্রকৃতি পূজারী এবং এদের কোনো ধর্মগ্রন্থও নেই[৪] চাকমারা এখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ভাষার দিক দিয়ে তারা ত্রিপুরা, মারমা বা অন্য যে কোনো পার্বত্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা এখন অনেকটা বাংলা ভাষার কাছাকাছি। মারমা (মগ)গণ আরাকানী বর্মীয় উপভাষায় কথা বলে এবং ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরি তিব্বতিধর্মী উপভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের ধর্মপ্রচারের জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত-সংলগ্ন মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার বেশিরভাগ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলে সেসব বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মের ছত্রছায়ায় একত্রিত করে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে ভারত-বাংলাদেশের এই পার্বত্য ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্বাংশের যুক্তরাষ্ট্রে ও পাশ্চাত্য শক্তি ইসরাইলের মতো একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায়ই নয়, বরং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক

বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সেসব মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল এবং বিস্তর অনৈক্য বর্তমান। এদের এক একটি জনগোষ্ঠীর বিবাহরীতি, আত্মীয়তা সম্পর্কে (Keenship Relations), সম্পত্তির মালিকানা বণ্টনরীতি এবং উত্তরাধিকার প্রথা, জন্ম ও মৃত্যুর সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক প্রথা এবং রীতি এক এক ধরনের এবং প্রায় প্রত্যেকটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[৫] পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব জনগোষ্ঠীগুলোর প্রায় সবাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তাদের পুরাতন বসতি স্থান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছ। নতুবা এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর পশ্চাদ্ধাবন করে আক্রমণকারী হিসেব এদেশে প্রবেশ করেছে।[৬] বর্তমানেও এদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর রেষারেষি এবং দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়।[৭] পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জনসংখ্যার বণ্টনচিত্রও সমান নয়। এরা গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে সারা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে। তবে কোনো কোনো স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিশ্র জনসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। চাকমারা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের চাকমা সার্কেলে কর্ণফুলী অববাহিকা এবং রাঙামাটি অঞ্চলে বাস করে। মগরা (মারমা) পার্বত্য চট্টগ্রামে দণিাংশের বোমাং এবং মং সার্কেলে বাস করে। ত্রিপুরা (টিপরা)গণ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে অর্থাৎ চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেল সকল স্থানেই ছড়িয়ে থাকলেও নিজেরা দল বেঁধে থাকে। ম্রো, খ্যাং, খুমী এবং মুরং বোমাং সার্কেলের বাসিন্দা। বাংলাভাষী বাঙালি অভিবাসীরা সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এদের বেশিরভাগই দলবদ্ধভাবে রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রামগড় প্রভৃতি শহরাঞ্চলে বসবাস করে। বাকি বাঙালি জনসংখ্যা এখানকার উর্বর উপত্যকাগুলোর সমভূমিতে গুচ্ছগ্রামে বসাবস করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বাদ দিলে এখন আসে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট-মৌলভীবাজারের খাসিয়া, মণিপুরী, পাত্র (পাত্তর) গোষ্ঠীর কথা। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গারোদের কথা এবং দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর-দিনাজপুরের কুচ রাজবংশী সাঁওতাল, ওরাও ও মুণ্ডাদের কথা। এদের সবাই সংখ্যার দিক বিচারে খুব নগণ্য ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রামণিত যে, সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া, মণিপুরী ও পাত্ররা তৎকালীন বৃহত্তর আসামের খাসিয়া জয়ন্তী পাহাড়, মণিপুর, কাঁচাড় ও অন্যান্য সংলগ্ন দুর্গম বনাচ্ছাদিত আরণ্যক জনপদ থেকে যুদ্ধ, আগ্রাসন, মহামারী এবং জীবিকার অন্বেষণে সুরমা অববাহিকায় প্রবেশ করে ও সিলেটের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করে। নৃ-বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক জ্ঞানের সকল বিশ্লেষণেই এরা উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বৈ আর কিছুই নয়। এরা কোনো বিবেচনায়ই সিলেটের আদিবাসী হতে পারে না। এরা আদি আরণ্যক পার্বত্য নিবাসের (আসাম, মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি) আদিবাসী হলেও যখন স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ভূখণ্ডে আসে সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠী কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে সমান্তরালভাবে থাকতে পারে। কিন্তু কখনো তারা নতুন জায়গায় আদিবাসী হতে পারে না। ঠিক একইভাবে, ময়মনসিংহ (হালুয়াঘাট অঞ্চল) এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলের (মধুপুর) গারো সিংট্যানেরা ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের পরে এদের অনেকে তাদের আদিনিবাস ভারতের উত্তরের গারো পাহাড়ে ফিরে গেলেও বেশ কিছুসংখ্যক গারো ও সিংট্যানরা বাংলাদেশের সেসব অঞ্চলে রয়ে গেছে। গারোদের আদি নিবাস ভারতের গারোল্যান্ড। কোনোক্রমেই ময়মনসিংহ কিংবা টাঙ্গাইলের আদিবাসী হতে পারে না। আরো বলা যায়, মাত্র ব্রিটিশ শাসনামলে আজ থেকে ৬০-৭০ কিংবা একশ, সোয়াশ বছর আগে সিলেটের শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং উত্তর সিলেটের কোনো কোনো নিচু পাহাড়ি অঞ্চলে চা বাগান স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বর্তমান ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি অঞ্চল যেমন– ছোট নাগপুরের বীরভূম, সীঙভূম, মানভূম, বাকুড়া, দুমকা, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল– যা তৎকালীন সাঁওতাল পরগণাখ্যাত ছিল সেসব অঞ্চলে গরিব অরণ্যচারী আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুল, বীর, অঁরাও, বাউরী ইত্যাদি নানা নামের কৃষ্ণকায় আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষকে শ্রমিক হিসেব স্থানান্তরিত করে অভিবাসী হিসেবে নিয়ে আসে।

একইভাবে যুদ্ধ, মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং জীবিকার সন্ধানে রাজমহলের গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলে (রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর) বাসবাস শুরু করে। উত্তরাঞ্চলের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে দক্ষিণের রংপুর-দিনাজপুরের নদী অববাহিকামণ্ডিত সমভূমিতে নেমে বসবাস শুরু করে কুচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী। এরা সকলেই তাদের মূল নিবাসের আদিবাসী হিসেব বিবেচ্য হলেও কোনো যুক্তিতে তাদের নতুন আবাসস্থল বাংলাদেশের ওইসব অঞ্চলগুলোর আদিবাসী বা ভূমিপত্র হিসেব চিহ্নিত হতে পারে না। উল্লেখ্য, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী

অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ও স্থানীয় অন্যান্য বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে কুচ রাজবংশীদের অনেকে সমসংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়ার (Acculturation Process) মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে একীভূত (Assemilated) হয়ে গেছে। এটা দোষের কিছু না বরং ভালো। মানবিক বিবেচনার মহানুভবতায় এদেশে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা, অধিকার ও স্বীয় জাতি, ভাষা, ধর্ম তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ অধিকার এবং সম্মান নিয়ে সবাই স্বকীয়তায় সমান্তরাল চলতে পারে বা মিশে যেতে পারে। কিন্তু কোন বিবেচনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ বাংলাদেশের আদিবাসী নয়।

প্রশ্নঃ আদিবাসী ইস্যু নিয়ে বর্তমানে হৈচৈ-এর কারণ কি?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছি। তারপরও আরও একটু বলার তাগিদ অনুভব করছি। এর উত্তরে আমি বলবো, তিমুরের দিকে চোখ তুলেন। পূর্ব তিমুর হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকে থেকে ইন্দোনেশিয়ার জন্য। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিমরাষ্ট্র। বিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ। এরমধ্যে ১৮ কোটি মুসলমান। এ মুসলমান দেশের উপস্থিতি মাত্র তিনকোটি মানুষের দেশ অস্ট্রেলিয়া হুমকি মনে করে। কারণ অস্ট্রেলিয়ার উত্তরেই হলো ইন্দোনেশিয়া। আর অস্ট্রেলিয়ার নিকটতম দ্বীপ হলো তিমুর। ইস্ট তিমুর ছিল পুর্তগিজ কলোনি আর ওয়েস্ট তিমুর ছিল দাজ কলোনি। গোটা ইন্দোনেশিয়া দাজ শুধু ওয়েস্ট তিমুর ছিল পুর্তগিজ। এই ইস্ট তিমুরের জনগণকে খ্রিস্টান করে ফেলে তারা। আর ওয়েস্ট তিমুরসহ গোটা ইন্দোনেশিয়া মুসলমান। বালিতে কিছু হিন্দু আছে। পুর্তগিজরা চলে যাওয়ার পর তিমুর ইন্দোনেশিয়ার সাথে থাকতো পারতো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া জিও পলিটিকসের মাধ্যমে এখাকার জনগণকে সংগঠিত করে বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছে। কারণ এখানে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া থাকলে যে কোন সময় ঘনবসতিপূর্ণ মুসলমানরা অস্ট্রেলিয়া দখল করে নিতে পারে এ আতংকে তারা এ ভূ-রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে জাতিসংঘের ব্যানারে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে, ইউরোপের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাহায্যে পূর্বতিমুর নামে স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এখন সে রাষ্ট্র পাহারা দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনী। সুতরাং ভূরাজনৈতিক কারণ এখানে নৃতাত্ত্বিক কারণের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ঠিক একইভাবে দেখুন সুদান বহুজাতি তাত্ত্বিক দেশ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকার একটি বড় দেশ। সেটার দারফুর অংশে উপজাতির ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভাজন সৃষ্টি করেছে। তারপর সবচেয়ে সম্পদ সমৃদ্ধ দক্ষিণ সুদান যেখানে রয়েছে তেল সমৃদ্ধ অ্যাবে অঞ্চল। এ অঞ্চলে আমেরিকার সিআইএ ও ইসরাইল অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। আশপাশের খ্রিস্ট রাষ্ট্রগুলো জনবল ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দিয়ে গণভোটের নাটক মঞ্চস্থ করে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির নামে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। অপর দিকে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেমন ফিলিপাইনের মুরোদের মিন্দানাও, সেখানে গোটা মিন্দানাও এর একটা অংশজুড়ে তারা। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এখনকার কয়েকটা রাজ্যে যেমন সুলু মিন্দানাও, কিন্তু সেখানে তারা কোন স্বাধীনতা দিচ্ছে না। কাশ্মীরেও স্বাধীনতা দিচ্ছে না। ভাষা তাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক সবদিক দিয়ে কাশ্মীরীরা আলাদা। সেখানে জাতিসংঘ ডাবলস্ট্যান্ডার্ড করছে। এভাবে চেচনিয়া, মিন্দানাওসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ ডাবলস্ট্যান্ডার্ড করছে। এসব দেশে গণভোট হলে সবাই স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেবে। আমাদের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পূর্ব তিমুর ও সুদানের মতো ভয়ংকর খেলা চলছে।

প্রশ্নঃ সরকার তাদের গত টার্মে শান্তি চুক্তি করেছে, এতে কতটুকু লাভ ক্ষতি হয়েছে?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ আওয়ামী লীগের শান্তিচুক্তি অবশ্যই জনমতের প্রতিফলন নয়। ক্ষমতায় থাকার কারণে আওয়ামী লীগ এ কাজ করেছে তা ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর গণভোট হলে অবশ্যই ৯০ ভাগ মানুষ বিরুদ্ধে ভোট দিতো। এ চুক্তি আমাদের অস্তিত্ব সংবিধান ও স্বার্থের বিরুদ্ধে। এ চুক্তির কিছু কিছু ধারা এখনো বাস্তবায়ন করতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার দু'বার ক্ষমতায় আসার পরও। পারবেও না। শান্তিচুক্তি যেদিন বাস্তবায়িত হবে সেদিন এখনকার অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাস্তহারা হবে। তাদেরকে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা বের করে দেবে। এ চুক্তি আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬, ৩৮ ও ৪২ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রশ্নঃ সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার নিয়েছে, তা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ সেনাবাহিনী এদেশের রক্ষক। সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনী সমূহ দেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে। এখানে দুস্কৃতিকারীদের দুটি গ্রুপ হয়ে গেছে তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি হানাহানি করছে। প্রায় প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে, রক্ত ঝরছে। সন্তু লারমা গ্রুপ আর মানবেন্দ্র লারমার গ্রুপ শান্তি চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধ করছে।
এ অস্থিরতা এবং এদের রক্ষা করতে সেখানে সেনাবাহিনী থাকা জরুরি। তাছাড়া এখানে আমাদের সীমান্ত আছে। এটা বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ এলাকা। এখান থেকে সেনা ক্যাম্প

প্রত্যাহার আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

এমনও রিপোর্ট আছে দেশের বাইরে থেকে ট্রেনিং নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা ঢুকছে। তাদের হাতে হাজার হাজার অস্ত্র আছে। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে এসব অস্ত্রে ভারতের ট্রেডমার্ক রয়েছে। অতএব এমন একটা অঞ্চলে সেনাবাহিনী থাকতেই হবে। যদি সিলেটে, ঢাকায়, রাজশাহীতে সেনাবাহিনী থাকতে পারে সেখানে পারবে না কেন? এটা তো আরো গুরুত্বপূর্ণ ও বিপন্ন এলাকা। আমাদের দেশের দশভাগের একভাগ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বনজ খনিজ সম্পদের নিরাপত্তার এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন পাবর্ত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী থাকা জরুরি। সর্বোপরি সেখানে যারা বসবাস করছেন তারাও আমাদের দেশের সম্মানিত নাগরিক তাদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই সংবিধানের অধীনেই সেনাবাহিনী এখানে থাকবে। যত সংখ্যক প্রয়োজন এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যা করা দরকার করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত তার ১৪ লাখ সেনা সদস্যের ৬ লাখই কাশ্মীরে রেখেছে, ৪ লাখ রেখেছে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। সেদেশে এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলছে না। অথচ বাংলাদেশের বিদেশি মদদপুষ্ট একশ্রেণীর মিডিয়া এ নিয়ে হৈচৈ করে। এখান থেকে সেনাপ্রত্যাহর বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বড় ধরনের হুমকি।

প্রশ্নঃ উপজাতিদেরকে আলাদা রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আনার কোন প্রকল্প জাতিসংঘের আছে কি?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ ব্রিটিশের ১৮৯৯ অথবা ১৯০০ সালের একটি এ্যাক্ট ছিল যে চট্টগ্রাম পাবর্ত্য অঞ্চলকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হবে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসন কাজের সুবিধার জন্য এ অ্যাক্ট জারি করেছিল। আমাদের স্বাধীন দেশে আমরা বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান মর্যাদার অধিকারী। যারা সেই অ্যাক্টের আলোকে দেশের কোন অঞ্চলের অথবা অধিবাসীর আলাদা গুরুত্বের কথা বলেন তারা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মূর্খের মতো এ কথা বলেন। সুতরাং এটার কোন ভিত্তি নেই। স্বাধীন দেশ চলবে তার সংবিধান অনুযায়ী। সেই অ্যাক্টের দোহাই দিয়ে তাদের আলাদা স্ট্যাটাস দেয়া যায় না। বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘন জনবসতি পূর্ণ দেশ। চট্টগ্রাম পাবর্ত্য এলাকা দেশের এক দশমাংশ অর্থাৎ ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার বা ৫ হাজার বর্গ মাইল। এখানে মাত্র ১৩ থেকে ১৫ লাখ মানুষ বসবাস করে। দেশের জনসংখ্যা অনুসারে সেখানে দুই কোটি মানুষ বসবাস করতে পারে।

প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন ছিলে জাতিসংঘের কোন রেজুলেশন আছে কিনা?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ আছে, তবে সেটা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ এখানে কোন আদিবাসী নেই। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ভারত, নিউজিল্যান্ডসহ যেসব দেশে আদিবাসী আছে তাদের জন্য। তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়, আলাদা স্ট্যাটাস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা আদিবাসী হিসেবে কোথাও স্বীকৃত নয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে না। কোন সরকারই করেনি। এরা আদিবাসী হলে অবশ্যই জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে আমরা মানতাম, কিন্তু আসলে এরা তো আদিবাসী নয়। বাংলাদেশে বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষীরা– যারা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto Astroloid) নামের আদি জনধারার অংশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তারাই একমাত্র আদিবাসী এবং Son of the Soil বলে দাবি করতে পারে। তাছাড়া আর কেউ আদিবাসী নয়। সুতরাং জাতিসংঘের এ রেজুলেসন আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

কিছুদিন আগে জাতিসংঘের একজন রিপোর্টার এদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য কোন উৎসসূত্র থেকে ইতিহাস ঐতিহ্য, রাজনীতি, নৃতাত্ত্বিক বিষয় না জেনে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা পক্ষপাতদুষ্ট, অজ্ঞানতা প্রসূত এবং ভুল। তিনি কিছু বিদেশি মদদপুষ্ট এনজিও এর প্রকাশিত বই ও বিভিন্ন সোর্স থেকে ভুল তথ্য পেয়ে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রিপোর্ট দিয়েছেন। তাদের সঠিকভাবে দালিলিক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে। আসল বিষয়টি তাদের সামনে উপস্থান করতে হবে। যাদের তারা আদিবাসী বলছে আসলে তারা সেটেলার। তার কথার প্রতিবাদ করাও হচ্ছে বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এর প্রতিবাদ করে বলেছেন বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই।

আমিও বলছি বাংলাদেশে অভিবাসী এসব ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী আমাদের সমান নাগরিক সুবিধা সম্মান পাবে। জাতিসংঘের এ রেজুলেশন যেসব দেশে প্রকৃত আদিবাসী আছে তাদের জন্য। কিন্তু কিছুতেই জাতিসংঘ ঘোষিত বাড়তি সুবিধা পেতে পারে না। কারণ তারা আদিবাসী নয় অভিবাসী, বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে এসেছে। শান্তিচুক্তিতে যে দেয়া হয়েছে সেটাও ভুল।

প্রশ্নঃ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সরকারের নিকট, পাবর্ত্য এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে, বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

প্রফেসর ড. আবদুর রবঃ সেনাবাহিনীর মেধাবী কর্মকর্তাগণ যে রিপোর্ট দিয়েছেন, অবশ্যই তা গুরুত্বপূর্ণ। তারা যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে

সরকারকে অবহিত করেছেন তা মোকাবেলায় অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ভারতে ট্রেনিং নিচ্ছে এবং সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র পায়। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারত থেকে এসে পুর্নবাসিত হয়েছে। তাদের হাতেও হাজার হাজার বাঙালি এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর লোক মারা গেছে। আগে ষড়যন্ত্র হয়েছে এখনো হচ্ছে। শান্তি বাহিনীর সন্তু লারমা এখনো বিচ্ছিন্নতাবাদ চাচ্ছে। এদের উস্কে দিচ্ছে বিদেশিরা। কারণ এখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চলছে। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতের কাজ নেই। যদিও বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো। কিন্তু সরকার এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে যে সেখানে তাবলীগ জামায়াতের কাজও নিষিদ্ধ। যদিও মুসলমানদেরকে এ এলাকায় মিশনারি কাজ করতে দেয়া গণতন্ত্রেরও দাবি, কিন্তু সরকার তা করতে দিচ্ছে না। খ্রিস্টান মিশনারিরা হাসপাতাল চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন জাতিসংঘের ইউএনডিপির আবরণে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান এনজিও ধর্মান্তরের কাজ করছে। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। এখানকার মিজোরাম, মণিপুরের, নাগাল্যান্ড ৯০/৮০ ভাগ খ্রিস্টান। বাংলাদেশের এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সেটেলারদের খ্রিস্টান করে এখানে এরা একটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র করার পরিকল্পনা করছে। সেনাবাহিনী সে দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছে। পূর্ব তিমুরের মতো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করতে সেনাবাহিনী এ্যাকশনে গেলে তারা বলবে অত্যাচার নির্যাতন করছে। কিন্তু আমি বলছি শুধু পাবর্ত্য কেন দেশের রাজশাহী, সিলেট যে কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সেনা বাহিনী কঠোর হাতে দমন করবে, এটাই স্বাভাবিক। তখন উচিত সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করা। এমন কি ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর নাগরিককেও দেশের অখণ্ডতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন: একশ্রেণীর মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে, এরা কারা?

প্রফেসর ড. আবদুর রব: এক কথায় বললে এরা মূর্খ। এদের কারো এনথ্রোপলজি, সোসোলজি, ইতিহাস, ভূগোল এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসী উপজাতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আর যারা জেনে বুঝে এ কাজ করছে তারা বিভিন্ন পারিতোষিক, বৃত্তি, উচ্চ বেতনের চাকরি প্রভৃতির লোভে করছে। প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা এনজিও কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাবশালীরা লোভের বশে দেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এমন মিথ্যাচার করছে।

প্রশ্ন: দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি?

প্রফেসর ড. আবদুর রব: চট্টগ্রামের পাবর্ত্য এলাকা আমদের মোট ভূ-খণ্ডের দশভাগের একভাগ। এ এলাকায় জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে যারা উস্কে দিতে তারা জানে না ওখানে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী-ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক তিন দিক থেকেই অভিবাসী। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানকার আদিবাসীও বাঙালিরা। তবে আমি মনে করি সকল নাগরিকের মতো এ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরাও বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশি। তারাও প্রত্যেক বাংলাদেশীর মতো সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত আমাদের এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র পবিত্র দায়িত্ব তাদেরও। বনজ সম্পদ, গ্যাসসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার এ এলাকায় পর্যটন শিল্প, স্কুল কলেজ নির্মাণ, হাসপাতাল, বিভিন্ন অ্যাকাডেমি, ক্যাডেট কলেজ ও মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ করে আরো ব্যাপক জনবসতি গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লেবাননের মাত্র একটি ভ্যালি বেকাভ্যালি যেখানে বাস করে ৪৮ লাখ, এর আয়তন ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আমাদের পার্বত্য এলাকার আয়তন ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার, অথচ এখানে বাস করে মাত্র ১৩ থেকে ১৫ লাখ লোক। এখানে চেংগুভ্যালি, সাংগুভ্যালি, মাতামুহুরিভ্যালি, কাচালংভ্যালিসহ ১২/১৩টি ভ্যালি আছে। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য এটা একটা সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার। এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন রিসোর্ট নির্মাণ করলে বাংলাদেশ বিশ হাজার কোটি টাকা অর্জন করতে পারবে। আমাদের বাজেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এখান থেকে আসতে পারে বলে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন।

শিগ্‌গিরই উন্মুক্ত হচ্ছে মাসিক আত-তাওহীদের ওয়েভ পেইজ
www.monthlyattawheed.com

[1] Morgan, ***An Introduction to Anthropology***, 1972
[2] Lewin, 1869, p. 28
[3] Shelley, 1992 and Lewin, 1869
[4] Bernot, 1960
[5] Denise and Bernot, 1957
[6] Hutchinson, 1909, Bernot, 1960 and Risley, 1991
[7] Belal, 1992

প্রিন্স আগা খান ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়

সম্পদের পাহাড় যাদের দখলে

নজরুল ইসলাম টিপু

ঘটনার মূলে যাবার আগে বলতে হয়, শিয়া মতবাদ ইসলামী মূল স্রোতধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও খণ্ডিত একটি গোষ্ঠী। ইসলামের কিছু অংশ মানা, কিছু অংশ অস্বীকার করা, সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আবার মিথ্যাকে সত্য বলে চাপিয়ে দেওয়া প্রবণতাই হল শিয়া মতবাদের মূল ভিত্তি। শিয়া মতবাদ অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, আবার সেখান থেকেও বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব মতবাদ বা গোষ্ঠীর মধ্যে একটির নাম নিজারী ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কম হলেও আলোচনায় সর্বদা তাদের নাম সবার আগে চলে আসে। সচেতন মুসলমানেরাও এদের সম্পর্কে তেমন একটি ধারনা রাখেন না, কিংবা সঠিক তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকেন। মুসলমানদের আচরণের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য থাকায়, এই সম্প্রদায়কে অনেকে মুসলিম মনে করে বিরাট ভুল করে। অথচ অনেকেই জানেন না যে, এদের কাজ ও বিশ্বাসের সাথে একমত হলেই, তার ঈমান নষ্ট হবে। আবার এদের খপ্পরে পড়লে বের হওয়াটা খুবই দুরহ! এরা খুবই শক্তিশালী, প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক। সংখ্যায় কম হলেও ক্ষমতার দাপট আকাশচুম্বী, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এদের নিয়ন্ত্রণ অবিশ্বাস্যজনক বেশি। তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি অনুগত মুসলমানদের নিজের ঈমান বাঁচানো ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে তাদের সম্পর্কে ধারনা রাখাটা খুবই জরুরি বলেই আজকের এই প্রতিবেদন।

আগা খানদের বংশীয় উৎপত্তি ও খ্যাতি

হাসান আলী শাহ (১৮০৪–১৮৮১)

তিনি আগা খান-১ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত এবং ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৬ তম ইমাম হিসেবে বিবেচিত। তিনি ইরানের খাহাকে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শাহ খলিল উল্লাহ ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৫ তম ইমাম। ১৮১৭ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি শিয়া গ্রুপের ইমাম মোল্লা হুসাইন ইয়াজদির অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে তিনি কতিপয় মুরিদসহ নিহত হন। হাসান আলী শাহ ১২ বছর বয়সে একেবারে বাল্যকালেই তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইসমাইলিয়া খিলাফতপ্রাপ্ত হন। তার মাতা বিবি শারকারা পুত্রকে নিয়ে দীর্ঘদিন ইরানের বিভিন্ন স্থানে স্বামী হত্যার বিচারর জন্য ধর্না দেন। বিবি শারকারা স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে ইরানের রাজা ফাতেহ আলী শাহের কাছে নালিশ দেন। রাজা ফাতেহ

আলী এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করেন। এমনকি রাজা স্বীয় কন্যা সৌরভ-ই-জাহানকে হাসান আলী শাহের সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে আগা খান উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর নতুন জামাতাকে ইরানের কোম নগরীর গভর্নর নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে তিনি ইরানের কারমান প্রদেশেরও গভর্নর নিযুক্ত হন। ধারনা করা হয় আগা খান শব্দটি তুর্কি ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ মহাসম্মানিত। হাসান আলী শাহ আরও রাষ্ট্র-ক্ষমতার আশায় আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে ধন্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। প্রথম দিকে রাজ্যজয়ে কিছুটা সফল হলেও চারিদিকে শত্রু বাড়িয়ে ফেলার কারণে শেষ যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের আশঙ্কায় তিনি তার লোকবল নিয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে আফগান সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতি বিদ্রোহীদের নমনীয় রাখতে ব্রিটিশ সরকার তাকে ব্যবহার করে। ব্রিটিশের প্রতি তার আন্তরিক কাজের ফলস্বরূপ, তিনি ব্রিটিশ রাজত্বের একজন নিরেট খাঁটি বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। ব্রিটিশ রাজত্ব হাসান আলী শাহর বিশ্বস্ততার জন্য যথেষ্ট আস্থাভাজন ছিলেন। পরবর্তীতে তার অধঃস্থন বংশধরেরা উত্তরাধিকারী সূত্রে নামের শেষে আগা খান লিখতে থাকেন। ব্রিটিশের কৃপায় এক পর্যায়ে তিনি তার অনুসারীসহ ভারতের বোম্বে নগরীতে চলে আসেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আকা আলী শাহ (১৮৩০-১৮৮৫)

আকা আলী আগা খান-২ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তিনি হাসান আলী শাহের জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৭ তম ইমাম মনোনীত হন। তার জন্ম হয় ইরানে। যেহেতু তার বাবা কোম ও কারমান নগরীর গভর্নর ছিলেন এবং তার মাতা রাজকন্যা ছিলেন। সে হিসেবে ইরানী রাজপরিবারে তিনি প্রিন্স খেতাবে বড় হয়ে উঠেন। আকা আলী তথা আগা খান-২ ব্যক্তি জীবনে উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান হন। পিতার ধর্ম প্রসিদ্ধি এবং মাতার রাজত্ব প্রসিদ্ধি তাকে বিশ্বময় পরিচিতি করে তুলে। তিনি পিতা-মাতার দুটি খ্যাতিকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। জন্মলগ্ন থেকেই ব্রিটিশ রাজত্বের বাহুল্য ও আশীর্বাদ তাকে বেষ্টন করে রেখেছিল। একজন ধর্মীয় প্রধান হিসেবে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি প্রিন্স হিসেবে একাধারে প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্মান নিয়েছেন আবার ধর্মগুরু হিসেবে নিরাপত্তা ও মর্যাদা গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পিতার চাইতেও অনেক বেশি আস্থাভাজন হয়ে উঠেন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। এর ফলে ব্রিটিশের কনোলিয়াল দেশগুলো (যেসব দেশে ব্রিটিশের ক্ষমতা কার্যকর ও শাসন চালু ছিল) তথা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট প্রভাব তৈরিতে সক্ষম হন। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় ব্রিটিশের বিশ্বস্ত নীতিনির্ধারক হিসেবে তিনি মুসলমানদের নেতা হয়ে ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন! ১৮৮৪ সালে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতের পুনেতে মৃত্যুবরণ করেন। চার বছর পরে তার মরদেহ ইরাকের নাজাফ নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী বংশধর গন তার পিতা আগা খান পদবির মতো আকা আলীর শাহের প্রিন্স পদবিও বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করতে থাকেন।

স্যার সুলতান মোহাম্মদ শাহ (১৮৭৫-১৯৫৭)

তিনি আগা খান-৩ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। মাত্র ৮ বছর বয়সে শিশুকালেই পিতার নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৮ তম ইমাম মনোনীত হন। তিনি পাকিস্তানের করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। একজন ধর্মগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতি তার মা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইসমাইলিয়াদের তিনি একত্রিত করেন। এ কাজে তিনি ব্রিটিশের সরাসরি সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছেন। ১৮৯৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট কমান্ডার উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৯০২ সালে তার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আরও বেড়ে যাবার কারণে ব্রিটিশ সপ্তম এডওয়ার্ড তাকে নাইট গ্র্যান্ড কমান্ডার উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকেই তিনি নামের আগে স্যার সুলতান লিখতে থাকেন। স্যার শব্দটি ব্রিটিশের অন্ধ আনুগত্যের একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি। এছাড়াও তিনি আরও অনেক খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন– নিজ সরকারের বিশ্বস্ত, চৌকস এবং সেরা কর্মকর্তা হিসেবে জার্মান সম্রাট তাকে খেতাব দেন। এমনকি তুর্কি সম্রাট ও পারস্য সাম্রাজ্য থেকেও তিনি রাষ্ট্রীয় স্বীকারোক্তি অর্জন করেন। ফলে তিনি পুরো ভারতে অসম্ভব ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং ব্রিটিশের নিকট শ্রেষ্ঠতম বিশ্বস্ত মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি হাসিল করেন! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আরব ও ইউরোপীয় ঘোড়ার সংমিশ্রণে উন্নত তেজি ঘোড়ার সংকর জাত সৃষ্টি করে দুনিয়াবাসীকে চমক লাগিয়ে দেন। এসব ঘোড়া বাজারে বিক্রি করে বহু মিলিয়ন ডলার অর্থ-সম্পদের মালিক হন। প্রতিযোগিতার জন্য সংকর জাত ঘোড়া সৃষ্টি করার পদ্ধতি শুধু তার দখলেই ছিল। সংকর জাতের নতুন প্রজাতির ঘোড়ার সৃষ্টির পিছনে মেধা খাটাতে গিয়ে তার দৃষ্টি অন্যদিকে প্রসারিত হয়ে যায়। তিনি তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, নারী-পুরুষ সবাইকে উচ্চশিক্ষিত হতে

হবে, তাহলে সম্পদ, খ্যাতি, ক্ষমতা পদতলে লুটিয়ে পড়বে। নামী-দামী বিদ্যালয়ে পড়তে হবে, তাহলে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সন্তানের সাথে পরিচিত হবে ফলে খ্যাতিমানদের সাথে বন্ধুত্ব হবে। তাদের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তাহলে পুরো পৃথিবীতে একটি ক্ষমতাশালী জাতি হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবে।

তৃতীয় আগা খান তার বহুমুখী প্রতিভা ও খ্যাতি দিয়েই পুরো ব্রিটিশ রাজত্বে; আফ্রিকা থেকে এশিয়ার বিশাল জনপদে তার মতাদর্শের অনুসারীদের ক্ষমতার প্রভাব-বলয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। সকল অনুসারীকে শিক্ষিত করে তুলতে তিনি শতভাগ সফল ছিলেন। আবার তাদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে বহাল, পেশাদারী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম কাউন্সিলে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন! প্রিভী কাউন্সিলের সদস্য ও লীগ অব নেশনের মেম্বার হিসেবে ভারতের হয়ে তিনি ব্রিটিশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ বহু টুকরায় বিভক্ত হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, জায়ারসহ পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়কে রক্ষা, একত্রিত করা ও স্বাবলম্বী করার কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি দিয়ে তিনি প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহযোগিতা ও মনোযোগ কেড়ে নিতে পারদর্শিতা দেখান। দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়কে একত্রিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের রক্ষার নামে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এই সম্প্রদায়কেই দিয়েছেন! ১৯৫৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরীতে তৃতীয় আগা খান মৃত্যুবরণ করেন। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে মিসরের নীল নদ-বিধৌত পর্যটন কেন্দ্র আসওয়ানে সমাহিত করা হয়। তিনি মৃত্যুর আগেই তার সমাধি তৈরি করে রেখেছিলেন। মৃত্যুকালে একটি উইলে লিখে যান, পারমাণবিক যুগের আধুনিকতায় সকল কিছুই বদলে গিয়েছে। তাই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে, ইসমাইলিয়াদের রক্ষার্থে, নিজ সম্প্রদায়কে উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে, ১৩০০ শত বছরের নিয়ম-রেওয়াজ ভঙ্গ করে, ছেলের ঘরের নাতি তথা করিম আগা খানকে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৯ তম ইমাম নির্বাচিত করা হল।

প্রিন্স করিম আগা খান (১৯৩৬–)

তিনি আগা খান-৪ হিসেবে প্রসিদ্ধ। যদিও তার স্থান হত ৫ নম্বরে, তার পিতা ও চাচাকে ডিঙিয়ে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হলে তিনি চতুর্থ আগা খান হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১৯৩৬ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদার উইল মোতাবেক পিতা প্রিন্স আলী আগা খান ও চাচা প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানকে টপকে মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৯ তম ইমাম মনোনীত হন। ইউরোপের সবচেয়ে দামী প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যান্ডের Institut Le Rosey School থেকে সদ্য বের হওয়া প্রিন্স করিম আগা খান ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ইমাম তথা ধর্মগুরুর দায়িত্ব পেয়ে যান। প্রধান ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পাবার দুই বছর পরে ১৯৫৯ সালে হার্ভাড ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সাথে ইতিহাসে গ্রাজুয়েশন শেষ করেন। তিনিই বর্তমানে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ইমামের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ফোবর্স ম্যাগাজিনের ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রিন্স করিম আগা খান ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদের মালিক। পৃথিবীর সেরা দশ জন রাজকীয় ধনীর একজন তিনি। তার অগণিত সম্পদরাজির মধ্যে ব্যক্তিগত দুটি গোলন্দাজ বিমান একটি বড় হেলিকপ্টার রয়েছে। নিজের বিমান ও নিজস্ব বাহিনী নিয়ে তিনি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন। প্রিন্স করিম আগা খান জগতবিখ্যাত অনেকগুলো কোম্পানির মালিক ও পরিচালক। হোটেল, মিল, ফ্যাক্টরি, শিল্প-কারখানা, চা বাগানসহ হেন কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান দুনিয়ায় বাকি নেই, যেখানে তার অর্থনৈতিক অবস্থান নেই।

ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন, দুটোই হল ইমানের মূল দাবি। তাই তাদের ইমামদেরকে, দু'জগতের খ্যাতি, যশ, ঐশ্বর্য, সম্পদ, সুখ লাভের জন্য; পরকালীন ধর্মীয় জ্ঞান যেমন দরকার। তেমনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য; বুদ্ধি-ভিত্তিক দক্ষতা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, আধুনিক জ্ঞান, ব্যবসা-প্রশাসন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা সম্পর্কেও পাণ্ডিত্য থাকতে হবে। বর্তমানে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের কাছে, ইহজাগতিক ও পরকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রিন্স করিম আগা খানের চেয়ে যোগ্য উত্তরসূরি দ্বিতীয়টি নেই! তার অগাধ সম্পদরাজির পরিমাণ, তা অর্জন করার আধুনিক জ্ঞান, সুচারু পরিচালনা, সময়ের সাথে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা, বিশ্বময় বাজার সৃষ্টি এবং অনুসারীদের হাতের মুঠোয় রাখতে পারার মাধ্যমে বোঝা যায়, তার যোগ্যতা-দক্ষতার মান কোন পর্যায়ে! এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ইমামদের সময়ে ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনের আলামত দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তনের দোলায় ইসলামের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত এই গোষ্ঠীটি বর্তমানে প্রায় খ্রিস্টধর্মের মতো হয়ে গেছে। তফাৎ শুধু এদের কিছু আচরণ দেখতে এখনও মুসলমানের মতো। তারা নিজেদের ইসমাইলিয়া মুসলমান দাবি করে, ইবাদতগৃহ দেখতে মসজিদের মতো।

নিজেদের খাঁটি মুসলমান দাবি করার বিপরীতে যখন তাদের অবস্থান এমন দেখা যায় যে; ধর্মের প্রতি অনুগত, বিত্তশালী, আধুনিক শিক্ষিত কিংবা সরকারের বড় কর্মকর্তা হিসেবে! তখন সাধারণ মুসলমান দ্বিধায় পড়ে যায়, কদাচিৎ নিজের অজান্তেই কোন এক সময় তাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। দুনিয়াবি সমস্যার সাময়িক সমাধানকল্পে চিরতরে তাদের হাতে ঈমান-আকিদা সব বিসর্জন করে বসে। একজন দুর্বল মানুষ তো দূরের কথা অধিক সচেতন মানুষও বুঝতে পারে না কার পাল্লায় পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে!

কিভাবে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন

১. নিজারী ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়, শিয়াদের মধ্য থেকে একটি দলছুট সম্প্রদায়। তাদের বিশ্বাসের মূলে শিয়া মতবাদ থাকায় বোঝা যায় সুন্নিদের সাথে তাদের সাংঘার্ষিক চিন্তাধারা আছেই। শিয়ারা দাবি করে আল্লাহ একজন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল। রাসুল (সা.) ইন্তিকালে খিলাফতের ইমামত হযরত আলী (রাযি.)-কে দিয়ে যান। রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ যে ইমামত রাসুল (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে দিয়ে যান, সে ইমামত একইভাবে তাদের অধঃস্থন বংশধরদের মাঝে বংশপরম্পরায় চলতে থাকবে! এটাই সকল শিয়াদের মূল দাবি। এই ক্ষেত্রে নিজারী শিয়ারা দাবি করে যে, নিজারী ইমামদের বংশধারা হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ঔরসজাত বংশধারা থেকে প্রবাহিত। নিজারী শিয়াদের দাবি ও তালিকা মোতাবেক তাদের প্রথম ইমাম হল হযরত আলী (রাযি.)। তাঁর পুত্র হুসাইন (রাযি.) দ্বিতীয় ইমাম, যথাক্রমে তাঁর পুত্র জয়নুল আবেদীন (রহ.) তৃতীয়, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) চতুর্থ, তাঁর পুত্র জাফর আস-সাদিক (রহ.) পঞ্চম। জাফর আস-সাদিকের দুই সন্তান; যথাক্রমে মুসা আল-কাযিম (রহ.) ও ইসমাইল (রহ.)। এই ইসমাইল (রহ.)-এর ১৪ তম অধঃস্থন পুরুষ নিজার এবং নিজারের ২৭ তম অধঃস্থন পুরুষ প্রথম আগা খান। খলিফা আলী (রাযি.)-এর সূত্র ধরে তাদের হিসেবে বর্তমানের প্রিন্স করিম আগা খান ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ৪৯ তম ইমাম।

২. এদের নিজস্ব কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। তারা দাবি করে যে, কুরআন হল তাদেরও ধর্মগ্রন্থ। তারা আরও দাবি করে যে, কুরআন সর্বকালের সমাধান দিতে দুনিয়াতে আসেনি। ১৪০০ বছর আগে তদানীন্তন আরবের সমস্যার সমাধান দিয়েই কুরআনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাদের ভাষায় সুন্নিরা কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ওহী আসার সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে বলে যে দাবি করা হয়, সেটিও আসলে ভুল ব্যাখ্যা! তাদের দৃষ্টিতে সঠিক হল, কিয়ামত পর্যন্ত আসমানি ওহী আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বান্দাদের ওপর আসতে থাকবে। যেভাবে ইসমাইলিয়া ইমামদের ওপর আসে। ফলে তারা কুরআনের কথা অস্বীকার করে না বরং সম্মান করে, তবে কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বের তদানীন্তন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আছে বলে, কাউকে পড়তে উৎসাহিত করা হয় না। তাদের মতে, এই ১৪০০ বছরে পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে গেছে, কুরআনে সে সবের কোন আধুনিক ব্যাখ্যা নেই। কুরআনে এসবের ব্যাখ্যা নেই বলে, ধর্ম তো আর এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! তাই ধর্ম-কর্মের গতি অব্যাহত রাখতে, ধর্মের সাথে সাজুস্য রেখে, আধুনিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও দিকনির্দেশনা দেবেন ধর্মের ইমামগণ। অনুসারীদের কিছু জানতে হলে ইমাম কিংবা ইমাম নিযুক্ত কোন ধর্মীয় পুরোহিতের শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়ই। এটাই হল ইসমাইলিয়াদের ঘোষিত রীতি।

৩. ইসমাইলিয়াদের ইমাম নির্বাচিত হন উত্তরাধিকার সূত্রে। যেভাবে উপরে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর বংশধর হওয়ার সুবাধে ইসমাইলিয়া ইমামদের সকল পাপ মার্জনীয়। তাদের পাপসমূহ লিপিবদ্ধ হয় না, তারা চিরকাল নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকবেন। অধিকন্তু ইমামেরা জগতের সমস্ত পাপী ইসমাইলিয়া অনুসারীর পাপ ক্ষমা করতে পারেন। একজন ইমাম যে কাউকে নিষ্পাপ করতে পারেন। পাপীরা ইমাম আগা খানের নিকট এসে পাপের প্রায়শ্চিত্বের জন্য ক্ষমা চাইলে, তিনি স্বীয় গুণে তা ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।

৪. ইমাম আগা খান দাবি করেন যে, তিনি খোদার প্রত্যক্ষ নূর তথা আলো। তার আর খোদার মাঝে কোন পর্দা নেই। তাই খোদা তায়ালা পৃথিবীর সকল ক্ষমতা তার হাতেই ন্যস্ত করেছেন। তিনি কারো কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটোই করতে পারেন। তাই তার পায়ে সাজদা করা যাবে এবং তা করা উচিত। ইমামের নিযুক্ত কোন ধর্মীয় গুরু, অনুসারীদের পাপ মোচন করতে পারেন। প্রিন্স করিম ইমাম আগা খান পাকিস্তান ভ্রমণে আসলে পর শত শত যুবতী নারী শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় রাস্তায় দুই পাশে শুয়ে মাথার চুল বিছিয়ে রাস্তা বানিয়েছিলেন। ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান যুবতীদের বিছানো চুলের ওপর দিয়ে পায়ে হেটে তাদের উৎসর্গকে ধন্য করেছিলেন।

৫. ইসমাইলিয়ারা ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি অনুসারে নামায-রোযা, হজ পালন করে না। বরং নামাযের স্থলে দৈনিক তিনবার আল্লাহর সাথে শিরক মিশ্রিত কিছু দুআ পড়ার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাকে। রোযার বেলায় বলা হয় তা ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। হজের ব্যাখ্যায় বলা হয় তা মহান আল্লাহর দিদার প্রাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণ। তা জীবনে একবার করতেই হয়, বর্তমান ইমাম হিসেবে প্রিন্স করিম আগা খানের চেহারার দিকে নজর দিতে

পারলেই হজকর্ম সম্পাদন হয়ে যায়। প্রিন্স করিম ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কখনও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে থাকেন। তখন তিনি তার অনুসারীদের দেখা দেওয়ার ব্যবস্থাটি করে থাকেন। এতে করে অনুসারীদের হজের অনুষ্ঠানটি পালন করার সুযোগ ঘটে যায়। এসব কাজে প্রতিটি দেশের সরকারগণ নিজ উদ্যোগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে তিনি যতবার এসেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে ততবার লালগালিচা সম্বর্ধনা পেয়েছেন।

৬. আগা খানের নির্বাচিত ধর্মীয় পুরোহিতেরাও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। এসব পুরোহিত বিভিন্ন দেশে গিয়ে হজের কাজটি মিটিয়ে দেন এবং অনুসারীদের ক্ষমা করে আসেন। অনুসারীরা বিশ্বাস করে, ইমামদের মাধ্যমে কোনভাবে একবার ক্ষমা পেয়ে গেলে, একই অপরাধের জন্য কিয়ামতের দিন নতুন করে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। ফলে অনুসারীরা ইমাম কিংবা পুরোহিতদের প্রতি খুবই অনুগত থাকে!

৭. ব্যক্তিগত জীবনে বর্তমান ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান বাল্যকালে কেনিয়া এবং বাকি জীবন ইউরোপে কাটানোর কারণে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব তাকে আচ্ছাদিত করে। তিনি খ্রিস্টধর্মের বাইবেলের সুসমাচার পদ্ধতির ওপর আকৃষ্ট ছিলেন। তার অনুসারীদের ক্ষমা করা করার রীতি-রেওয়াজ দেখতে বাইবেলের মতোই। ধর্মবিশ্বাস মুসলমানদের মতো না-হয়ে তা খ্রিস্টধর্মের কাছাকাছি হয়ে যায়। নম্র-ভদ্রতায় খ্রিস্টীয় চরিত্র, বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ইসলামি কায়দা, পীরদের মুরিদ করার স্টাইলে এসব কাজ করা হয়। সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং নিজের অজান্তে ভুল পথে পরিচালিত হয়।

৮. ইমাম করিম আগা খানের বড় মেয়ে প্রিন্সেস জাহারা হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষে বিয়ে করেন ব্রিটিশ মডেল ও ব্যবসায়ী মার্ক বয়ডেনকে। এরপর থেকে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে খ্রিস্টানদের অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটে যায়। এই ঘটনার পরে ইমামে জামান ধর্মীয় রীতিতে সংশোধনী আনেন। নতুন আইনে বলা হয়, প্রতিপত্তি লাভের আশায় ইসমাইলিয়া মুসলমান মেয়েরা যদি খ্রিস্টান ছেলেদের পছন্দ করে, তাহলে কন্যার বাবা-মা বিয়েতে বাধ সাধতে পারবে না। তাদেরকে তাদের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে এক ধর্মের হলে গেলে এক কথা ছিল, যেমন প্রিন্স করিম আগা খানের দুজন বিধর্মী স্ত্রী মুসলমান হয়েছিলেন, তাই সমস্যা ছিল না। এখানে কন্যা প্রিন্সেস জাহারা ও তার হবু স্বামী কেউ তাদের স্বীয় ধর্ম পরিবর্তন করেননি। সেজন্যই ধর্মীয় নীতিতে সংশোধনী আনাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

৯. পবিত্র কুরআনে সরাসরি হারাম ঘোষিত কিছু বিষয়কে আগা খান হালাল ঘোষণা করেছেন। ইমামের তত্ত্বাবধানে একটি ইসলামি তরিকা বোর্ড পরিচালিত হয়। নতুন পরিবর্তিত কানুনগুলো তরিকা বোর্ডে পাশ হতে হয়। পাশ হওয়ার পরপরই তা ধর্মের অনুসারীদের জন্য মেনে চলা আবশ্যক হয়ে যায়। আগা খান তরিকা বোর্ডের মাধ্যমে সুদকে হালাল ঘোষণা করেছেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান AKFED (Aga Khan Fund & Economic Development) গড়ে তুলেছিলেন। যে প্রকল্পে তাদের নিজেদের মানুষের মাধ্যমে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থায় তারা পৃথিবীর দেশে দেশে বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। যার নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের সকল কাজ ইসমাইলিয়াদের হাতে থাকে। আবার রাষ্ট্রশক্তিরও সমর্থন পায়। কেননা প্রতিটি রাষ্ট্রই এটাকে নিজেকের দেশের উন্নয়নের গতি হিসেবে ভেবে থাকে। এসব কাজকে ইংরেজিতে Venture Capital হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক স্বয়ং আগা খান নিজেই এবং এর মাধ্যমে সহজে ঋণ দেওয়ার কারণে দুনিয়াতে তার সাফল্য ও সফলতা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে AKFED-এর চেয়ে শক্তিশালী কোন অর্থনৈতিক সংস্থা নেই। যার ফল ভোগ করে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। আগা খান এসব প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে চ্যারিটি, সমাজ-উন্নয়ন, খেলাধুলা ও সহযোগিতার নামে সাহায্য দিয়ে থাকে। এতে করে ব্যক্তি প্রিন্স আগা খান একটি প্রবল, উদার ও বিশাল হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্তরালে বিভিন্ন দেশের সরকার থেকে তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য ইচ্ছামতো সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেন। Venture Capital পদ্ধতির লাভ ও দীর্ঘ মেয়াদি স্থায়িত্ব দেখে এনজিওসহ নানা ধরনের সংস্থা, আর্থিক লাভের আশায় নতুন করে বহু সাহায্য সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে আগা খানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যে নিবেদিত; এনজিওদের লক্ষ্য সে উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয় বলে এনজিওগুলো গরীবের রক্তচোষাকে লক্ষ্য স্থির করে। এনজিওরা মার খায় এবং তাদের ঋণ নিয়ে গরীবের সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে। আগা খানের সংস্থা লাভের সাথে আদর্শিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে জড়িয়ে রাখে বলে এনজিওদের মতো মার খায় না। উদারহণ হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের নাম বলা যায়, যারা ব্যবসার সাথে একটি আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উজ্বল করতে চায়, ফলে সেটা দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

১০. মুসলিম উম্মাহ ও তাদের নেতারা এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে অনেক দূরে। এসব নিয়ে ভাবার মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞা তাদের অনেকের থাকলেও তারা এসব

বিষয়কে দুনিয়াবি বিষয় বলে উপেক্ষা করতে চায়। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ভয়ে কিংবা তথ্যহীনতার কারণে এসবকে উপেক্ষা করে চলে। প্রিন্স করিম আগা খানের ইমামতে তাদের হিসেবে পুরো দুনিয়াতে অনুসারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে বহু দেশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আগা খান তাজিকিস্তানে ঢুকে পড়ে এবং AKFED-এর মাধ্যমে ব্যাপক শিল্প-কারখানা গড়ে তুলে। দীর্ঘ বছর কমিউনিস্টের যাঁতাকলে পিষ্ট সেখানকার মুসলমানেরা ইসলামের মূল ভিত্তি থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এই সুযোগটি কাজে লাগায় আগা খানের অনুসারীরা। তারা মানুষদের ইহকালীন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীর সাথে সাথে পরকালীন মুক্তির জন্য ইসমাইলিয়া ধর্মকে উপস্থাপন করে। দলে দলে মানুষ তাদের সাথে ভিড়ে যায়! এই পদ্ধতিতে শুধু তাজিকিস্তান থেকেই প্রায় এক কোটি অনুসারীকে দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়! প্রিন্স করিম বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করেন যে, এখন তার অনুসারীর সংখ্যা দেড় কোটি! ইসলামি দুনিয়ার অনৈক্য, ইহকালের সমৃদ্ধিকে দুনিয়ার লোভ ভাবা ও পরকালীন কল্যাণের জন্য বৈরাগ্য নীতিগ্রহণ, যুগোপযোগী জ্ঞানের অভাব ও ইসলাম প্রচারে অবহেলার সুযোগ নিয়ে ইসমাইলিয়ারা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঢুকে পড়েছে অনেক আগেই। অর্থনৈতিক সুবিধার ধুয়া তুলে কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজানসহ বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির লোভ দেখিয়ে তাদের ঈমান-আকিদাকে শেষ করে দিচ্ছে।

১১. আজ দুনিয়ার প্রতিটি জাতি, শক্তি ও রাষ্ট্র আগা খানের সুবিধা নিয়ে তাদের দেওয়া অর্থে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতামূলক কাজ করে যাচ্ছে। অর্থ দিচ্ছে AKFED আর তার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিগুলো। কিছু ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থের লোভে ধর্ম-বিনষ্টকারী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। নিজের সমুদয় যোগ্যতা, দক্ষতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচক্ষণতা আগা খানের বেতনের লোভে নিজ জাতির বিরুদ্ধে ঘটিয়ে চলছে। সচেতনতা, তথ্য-উপাত্ত, দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেমবোধ ও বিশুদ্ধ ঈমানের অভাবে মুসলমানেরা দাঁড়াতে পারছে না। আগা খানের বিভিন্ন সংস্থা পাকিস্তান, ভারত, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, কেনিয়া, বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে তাজিকিস্তানকে পুরোপুরি করতলগত করে এখন তারা দৃষ্টি দিয়েছে মুসলিম মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূভাগের দুর্বল জনগোষ্ঠীর দিকে।

১২. আগা খানের AKFED ফান্ড এখন আরও বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। শিক্ষা-চিকিৎসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ বিশ্বমানের অত্যাধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ প্রজেক্ট গড়ে তুলবে। বিভিন্ন দেশে শত বিলিয়ন ডলার অর্থ এসব প্রজেক্টে ইনভেস্টের অপেক্ষায়। সহজে নজর কাড়ার মতো যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এই ফান্ডের আছে। আগা খান গোল্ড কাপ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক সময় তারা একাই দুনিয়াকে মাতিয়ে রেখেছিল। জাগতিক প্রতিটি বিষয়ে তাদের রয়েছে প্রচুর বিশেষজ্ঞ। তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলাকে জীবনের প্রধান সোপান মনে করে। সুতরাং তারা সংখ্যায় কম হলেও শক্তিকে বিপুল। আজ মুসলমানদের সময় এসেছে এসব বিষয় নিয়ে সচেতন হওয়ার। এই শক্তির মোকাবেলা করতে হলে, নিজেদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করানো ব্যতীত কোন পথ নেই। শিক্ষাকে যদি উন্নতির সোপান মনে করে সামনে পথ চলা শুরু হয়, তাহলে তাদের দুনিয়াবি এবং পরকালীন মুক্তির পথ মিলতে পারে। তাছাড়া এসবের বিপরীতে ভূমিকা না রাখাও শিয়া বিশ্বাসের দাবি নয়।

ব্যক্তিজীবনে প্রিন্স করিম আগা খান

বর্তমান ইমাম আগা খানের ব্যক্তিজীবনের দু'একটি ঘটনা উল্লেখ না করলে নয়। আগা খান ইমামত পাবার দু'বছর পর তথা ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ মডেল কন্যা সারাহকে বিয়ে করেন। সারাহের জন্য এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে, তিনি ইসমাইলিয়া মতবাদ গ্রহণ করে নাম রাখেন বেগম সালিমা আগা খান। দীর্ঘ সংসার জীবনের এক পর্যায়ে সালিমাহ স্বামীর আচরণে সন্দেহ পোষণ করেন! স্বামীর সাথে বিভিন্ন নারীর উঠা-বসাকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। এই নিয়ে স্ত্রী সালিমা ১০ বছর পৃথক থেকেছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তা হন। আগা খান ১৯৯৮ সালে গ্যাব্রিয়েল নামের ইউরোপিয়ান আরেক তরুণীকে বিয়ে করেন, যিনি ইসমাইলিয়া মতবাদ গ্রহণ করে নাম রাখেন বেগম ইনারা আগা খান। তিনিও পূর্বের স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর আচরণের খুশি ছিলেন না। ফলে ২০১১ সালে ৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তা হন। আগা খান পরিবারের বউ হিসেবে এই দুই রমণী পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছিলেন, যার কারণে তাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের এসব কাহিনী দুনিয়ার সেরা খবরের একটি বিরাট অংশ দখল করে রেখেছিল।

তার ব্যক্তিজীবনের এই কাহিনীটি নিন্দা করার জন্য তোলা হয়নি। এগুলো কোন গোপনীয় কথা নয়, বরং দুনিয়া কাপানো কাহিনীর মধ্যে অন্যতম। এই ধরনের কোন ঘটনা একজন সাধারণ ইসলামি নেতার জীবনে ঘটলে দুনিয়াতে তার বেঁচে থাকা দায় হত। প্রিন্স করিম আগা খানের জীবনে এসব মামুলি ঘটনা। তাদের ধর্মীয় চেতনাবোধে এসব ঘটনা

কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং ২০১২ সালের হিসেব মতে, ইমাম আগা খান বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০০ জন ব্যক্তিদের মাঝে ৩১ তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন! ব্যক্তিজীবন নিয়ে তারা তাদের ইমামের সমালোচনায় পঞ্চমুখর হয় না! এমনকি এত কিছুর পরও তিনি পাপীদের পাপ মোচনের অধিকার হারাননি। অধিকন্তু প্রতিজন নিজারী ইসমাইলিয়া শিয়া প্রতিবছর তাদের ইমাম প্রিন্স করিম আগা খানকে তাদের ধর্মীয় ভাষায় দাসন্দ দিয়ে থাকেন। যার পরিমাণ পৃথিবীর সকল ইসমাইলিয়াদের বার্ষিক আয়ের ১২.৫%! ধারনা করা হয় এই ফান্ডেই প্রতি বছর হাজার মিলিয়ন ডলার জমা হয়। দৃশ্যত অনুসারীদের ভালোবাসা এই কারণেই দৃঢ় হয়েছে যে, তিনি তার অনুসারীদের পরকালীন জীবনকে হয়ত সন্দেহাতীত করে রেখেছেন, তবে দুনিয়াতে তাদের কাউকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখেননি। তাই সবাই তাকে অকাতরে ভালোবাসে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসমাইলিয়াদের সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সম্পর্ক নেই। ইসলামের বাইরে তারা একটি আলাদা সম্প্রদায়। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কুরআন ও সুন্নাতের আহকাম পালনেও তারা যত্নশীল নয়। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশত তাদের মুসলমান মনে করে। তাদের উপসনাগুলোর দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। ভেতরে কী হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মুসলিম বিশ্বের তুলনায় ব্রিটিশ তথা খ্রিস্টজগতের সাথে তাদের সখ্যতা অধিক। তাদের সচিবালয় ফ্রান্সে অবস্থিত। গোটা দুনিয়ায় ইসমাইলিদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। নিজের সম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দরিদ্র মুসলমানের সাহায্যে তারা নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসে না।

লেখক: আমিরাত প্রবাসী

আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি

- প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌঁছাতে হবে।
- বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে।
- লেখা A-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাঁক রেখে লিখতে হবে। কোন ক্ষেত্রে A-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়।
- আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে।
- প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে।
- ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে। যেমন– আন-নাসায়ী, ***আস-সুনানুল কুবরা***, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক।
- লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য। লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা হয়।
- লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো। প্রতিটি লেখা ৫–৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
- লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি।
- গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক।
- দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না।

মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের সংকট ও সম্ভাবনা

খান শরীফুজ্জামান

১৪ আগস্ট ২০১৩ মুসলিম বিশ্ব দেখল মুসলিমদের রক্তে নীলনদ কীভাবে লালনদ হয়ে উঠল। কীভাবে নীলনদের ধারার সাথে মুসলিম সন্ত্রাসীদের (ধর্মনিপেক্ষ ও পশ্চিমা মোড়লদের মতে) রক্ত ধারা বয়ে গেল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য আরো একবার মুসলিমরা এপ্রিল ফুলের মতো গণতন্ত্রের ফুলে পরিণত হলো। তিন তিন বার নির্বাচনের পরীক্ষা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েও মডারেট মুসলিম ব্রাদারহুড শেষ রক্ষা পেল না- বিশ্বগণতন্ত্রের মোড়ল আমেরিকা-ইসরাঈলের অনুগত মিশরীয় সেনাবাহিনীর হাত থেকে। আরব বসন্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া মুরসিকে বিতাড়িত করে সেই স্বৈরতান্ত্রিক ফেরাউন মোবারককে মুক্ত কণ্ডে পুরস্কৃত করা হলো। এমন ঘটনার পর মুসলিম বিশ্বের আজকের তরুণরা যদি গণতন্ত্রের রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বাকি বিশ্বকে তা হাসি মুখেই গ্রহণ করতে হবে। যে কোনো পন্থা ও ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদেও অধিকার প্রতিষ্ঠার মানবিক অধিকার তরুণদের রয়েছে। সেনাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এই অভিযানে মারা গেছে ৫২৫ জন। অপর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুড দাবি করেছে, দুই হাজার ৬০০ জন মারা গেছে। আমরা ৯০-এর দশকে আলজেরিয়ায় দেখেছি, ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ার পরও সেনাবাহিনী সে ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং লিয়ামেন জেরুয়ালের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। লিয়ামিন জেরুয়াল তিন দশক ধরে দেশটিতে একদলীয় শাসন কায়েম করে রেখেছে। নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেয়ার ফল হিসেবে আলজেরিয়ায় জনগণকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মুখে পড়তে হয়েছে। আলজেরিয়ার সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলো মিকরের আজকের সেকুলার দলগুলোর মতোই সেনা শাসককে সমর্থন জানিয়েছিল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, মিসরও আলজেরিয়ার পরিণতির পথে হাটছে। মজার ব্যাপার, আজ পশ্চিমাবিশ্ব মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রায়ণের মার্কেটিং বাদ দিয়ে সেনাশাসক জেনারেল সিসির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও কাউন্টার পাঞ্চ- এর লেখক ইসাম আল-আমিন তার সাম্প্রতিক একটি লেখায় লিখেছেন, 'আলজেরিয়া ও ফিলিস্তিনের (হামাসকে) মানুষ যখন ১৯৯২ ও ২০০৬ সালে ইসলামপন্থিদের নির্বাচিত করেছে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় ইসলামপন্থিদের বিজয়কে ভিন্ন চোখে দেখেছে। মিকরেও ইসলামপন্থিদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। গত দুই দশকে এটা তৃতীয় বার— ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাবিশ্বের এরূপ অবস্থান ভবিষ্যতে ইসলামি দলগুলোর সাথে পশ্চিমাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নির্ণায়ক হতে পারে।'

মুসলিমবিশ্বের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস

মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রায়ণের সংকট বিষয়ে জানতে চাইলে আমাদের মুসলিম বিশ্বেও রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত সম্পর্কে জানা জরুরি। মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক ছিল উসমানিয় খিলাফত। ১৯২৪ সাল নাগাদ মুসলিমদেও রাজনৈতিক উদাসিনতা ও দীর্ঘমেয়াদী পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের কারণে ভেঙে পড়ে খিলাফত ব্যবস্থা। যে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিল সামরিক বাহিনীর সদস্য কামাল আতাতুর্ক। খিলাফতকে ভেঙ্গে তুরস্ককে সেকুলারাইজ করারও মূল নায়ক। ষড়যন্ত্র সফল হওয়া ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জন পার্লামেন্টে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, বাস্তবতা এমন যে তুরস্ক আজ মৃত,

আর কখনো সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ, আমরা তার নৈতিক শক্তিকে ধ্বংস কওে দিয়েছি, আর তার নৈতিক শক্তি ছিল খিলাফত ব্যবস্থা ও ইসলাম। (The situation now is that Turkey is dead and will never rise again, because we have destroyed its moral strength, the Caliphate and Islam.) লর্ড কার্জন সতর্ক করে বলেন, আমাদের সে সব বিষয় গুলোও ধ্বংস করতে হবে যা মুসলিমদেও মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। কার্জনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি ৬ অক্টোবর, ২০০৫ আমরা বৃটিশ সরাষ্ট্রসচিব চার্লস ক্লার্কের হেরিটেজ ফাউন্ডেশন (British Home Secretary Charles Clarke) বক্তব্যের মাঝেও পাই। তিনি বলেন, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শরিয়া আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হতে পারে না—ওই পথে হাটার ব্যাপারে মুসলিমদেও হুশিয়ারি করা হয়েছে।' অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় খিলাফতের পতন ছিল মুসলিম বিশ্বেও মানুষের জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট। মূলত এরপর থেকে শুরু হয় পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মুসলিম ভূ-খণ্ড দখল ও সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা। সশস্ত্র আগ্রাসন ও অসমযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় এ রাষ্ট্রগুলোর ওপর। নির্বিচারে শুরু হয় আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা-যুবকদের নিষ্পেষণ, ধর্ষণ ও গণহত্যার উৎসব। আফগানিস্তান ও উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং সর্বশেষে ৯/১১ পর তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এ অঞ্চলের ঘটনা প্রবাহে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। যাইহোক, খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি হয় ''ভ্যাকুম অব পলিটিক্যাল সিস্টেম এন্ড পলিটিক্যাল লিডারশিপ' (vaccume of political system and political leadership)। ফলে শুরু হয় সামরিক শাসন, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সর্বশেষে পুতুল সরকার ব্যাবস্থা। তবে, এ সকল ব্যাবস্থার অনুকূলে পশ্চিমা পুঁজিবাদী শাসক গোষ্ঠির প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ও ইন্ধোন ছিল। এখনো আছে। যারা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের সাম্য ও স্বাধীনতার এক অলীক ধারণা বিকিয়ে যাচ্ছে মুখোরোচক আলোচনার টেবিলে।

মুসলিম বিশ্বে নির্বাচন আর গণতন্ত্র কখনো এক নয়

নির্বাচন হলো পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বোচ্চ সংগঠন রাষ্ট্রের নেতা খুঁজে বের করার একটি উপায়। যা একটি পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী ব্যবস্থা তথা সকল ব্যবস্থার মধ্যেই গ্রহণযোগ্য নেতা নির্বাচনের একটি উপকরণ মাত্র। ইলেকশন কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনরার আদর্শ নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর, ইরাক, ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের মানুষ দীর্ঘ দিন উপনিবেশিক অত্যাচার ও স্বৈরাচারী শাসকদেও কারণে যথার্থভাবে তাদের মতামত প্রকাশের সুজোগ না পাওয়ায় নির্বাচনে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্র আর ইলেকশন এক নয় বলেই পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এমন অপশন জনগণকে দেওয়া হয়নি যে জনগণ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র চায় না-কি সমাজতন্ত্র চায়। যেকটি মুসলিম দেশে এখন নামকাওয়াস্তে তথাকথিত গণতন্ত্র আছে সেগুলোর কোনোটিতেই গণতন্ত্র জনগণের মতামত নিয়ে আরোপ করা হয়নি। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা-নাহলে তারা জনগণের কাছে অপশন দিত যে জনগণ কি 'ইসলামী শাসন ব্যবস্থা' চায় না-কি 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' চায়। অর্থাৎ ইলেকশন আর গণতন্ত্র এক নয়। মিকরে ইসলামপন্থি সংবিধানের (আংশিক ইসলামী আইন সংবলিত সংবিধান) জন্য নির্বাচন হয়েছিল, ইসলামপন্থিরাই জিতেছিল।

আধুনিক ও বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সকলেই একমত যে ইলেকশন অনুষ্ঠিত হলেই একটি জাতিকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। মূলত: প্রচলিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেও উৎপত্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের থেকে উৎসারিত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তির স্বার্বভৌমত্ব তথা জনগণের স্বার্বভৌমত্ব। সর্বোপরি উদারবাদী চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনেও। এসবের সম্মিলিত প্যাকেজই আজকের আধুনিক পুঁজিবাদ যা মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়নের মতো বিভিন্ন নতুন নতুন নামে বিশ্বব্যবস্থায় বাজারজাত করণ করা হচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতার দর্শন থেকে যে হোমোসেক্সুচুয়ালিটি, এডালট্রি, পর্নোগ্রাফি ও মদ্যপানের সংস্কৃতি পশ্চিমে গড়ে উঠেছে এর প্রত্যেকটি বিশ্বাসই ইসলাম ও মুসলিমদেও বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভিন্ন বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধারক মুসলিমরা তাদেও আদর্শে অনড় ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। ইরাক অথবা আফগানিস্তানের মানুষ কখনোই বিশ্বাস কওে না পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সংঘাত আজ মুসলিমসহ সারা বিশ্বে দিনের আলোর মতো পরিস্কার। এছাড়া মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রেও সফলতার কথা তুললে অনেকেই মালায়েশিয়া ও তুরস্কের কথা উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে মালায়েশিয়ার উন্নতি হয়েছে মূলত মাহাথির মুহম্মদেও এক ধরনে এক নায়কত্বের শাসনামলে। বাকি থাকল তুরস্ক। সেখানের সেকুলাইজেশন প্রজেক্টও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। গত প্রায় এক দশক সেখানেও ইসলামপন্থিরাই ক্ষমতায় আছে। এই এ.কে পার্টির বিরুদ্ধে সেখানের সেকুলাররা প্রায়ই দাবি তোলে, দলটি নাকি আবার উসমানীয় ঢংয়ের শাসন ব্যাবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আর দেশ দুটির সংবিধান ও সাধারণ মানুষের মধ্যেও পশ্চিমা

সেকুলার আদর্শ ও সংস্কৃতির গণতন্ত্রের কোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইরাক-আফগানিস্তানেও আমেরিক গণতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কওে সেখানে সুশান আনতে পুরোপুরি ব্যর্থ। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসও ভালো কিছু নয়। তাই মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রায়নের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কা যে কোনো ইতিহাস সচেতন মানুষেরই আছে।

আমেরিকান বিশিষ্ট নীতি নির্ধারক ও বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইচ পি হান্টিংটন তার 'দ্য ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন' থিসিসের মধ্যে বলেছেন, 'সভ্যতাসমুহের দ্বন্দ্ব ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করবে। সভ্যতাসমুহের বিভেদরেখাই ভবিষ্যত সংঘাতের পথ বাতলে দেবে।—আর এ সভ্যতাসমুহের বিভেদরেখাই পশ্চিমা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে ১৩০০ বছরের দ্বন্দ্বের ইতিহাস গড়ে তুলেছে।' মুসলিমদের তথা ইসলামের জীবনাদর্শ যে পশ্চিমা পুজিঁবাদী গণতন্ত্রের অনুকূলে নয় এ সত্য উপলব্ধি করেই কি আমেরিকান সাবেক রাষ্ট্রপতি নিক্সন তার 'ভিক্ট্রি উইদাউট ওয়ার' বইয়ের মধ্যে বলেছেন, 'সাম্যবাদী ও ইসলামী বিপ্লবী উভয়ই আমাদের আদর্শিক শত্রু। যাদের উদ্দেশ্যও অভিন্ন। তারা তাদেও আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ব্যবহার কওে এক ধরনের কতৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কয়েম করতে চায় যা কোনো মতেই গ্রহরণযোগ্য নয়।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এইচ পি হান্টিংটন তার 'ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন এন্ড রিমেকিং দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডা' বইয়ের মধ্যে খোলসা করেই বলেছেন, 'ইসলামী মৌলবাদ পশ্চাত্যের জন্য কোনো অন্তর্নিহিত সমস্যা নয়। 'ইসলাম'ই সমস্যার মূল কারণ। এটা এক স্বতন্ত্র সভ্যতা, যার আওতাভূক্ত মানবমণ্ডলী তাদেও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তারা ক্ষমতার দিক দিয়ে পিছিয়ে বিধায় আবেগ আক্রান্ত (পৃ. ১০৯-১১০)।

মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের স্বার্থ বিরোধী

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা ও তাদের সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে মসনদে টিকিয়ে রাখার বিষয়গুলো আজ বুঝতে আর কারো বাকী নেই। ওসমানিয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলো থেকে সম্পদ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ-ফ্রান্স-আমেরিকা কখনো স্বৈরশাসক আবার কখনো সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকদের সঙ্গে আমেরিকার দহরম মহরম সম্পর্কের কথা কারো না জানা নেই। জামাল আব্দুল নাসের, ইসলাম কারিমভ, হোসনে জাইম, করিম কাসেম, হাফিজ আল আসাদ, জেনারেল সুহার্তো, সাদ্দাম, সৌদ বংশের শাসকগণ, গাদ্দাফি, মোবারক, আইয়ুব খান, জিয়াউল হক, মোশাররফদের মতো বর্তমান ও সাবেক স্বৈরশাসকরা আমেরিকা-বৃটেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনে টিকে আছে, টিকে ছিল। তেল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনায় ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রিয় মোসাদ্দেক সরকারকে হটিয়ে রেজা শাহ পাহলভীকে ক্ষমতায় বসায়। অনুগত স্বৈরশাসক রেজা শাহ পাহলভীর শাসনামলে সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের নামে আমেরিকা বার্ষিক ত্রিশ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করত। ১৯৯৫ সালে ক্লিনটন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন কর্মকর্তা নিইয়র্ক টাইমসে ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক জেনারেল সুহার্তোকে 'আওয়ার কাইন্ড অফ গাই' হিসেবে সম্মোধন করেন। এতে সুস্পষ্ট হয়, ইন্দোনেশিয়ায় তার আমলের গণহত্যা, জুলুম ও স্বৈরশাসনের প্রতি আমেরিকার নগ্ন সমর্থন ছিল। সাদ্দাম হোসেনের ঘটনাও ব্যতিক্রম কিছু নয়। তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ দেশগুলোর স্বৈরশাসকদের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করা আমেরিকা-ব্রিটেনের লক্ষ্য নয়।

গণতন্ত্র নিয়ে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে মতভেদ

কিছু বড় ইসলামি দল রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তাই বিশ্বেও বহু দেশে তাদেও শাখা বা সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কওে না। মুসলিম বিশ্বেও সুন্নি মতবাদে বিশ্বাসী সবগুলোর কোনোটিই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস কওে না। যে দলগুলো গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তারা নির্বাচনকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণে একটি মাধ্যম বা হিকমা হিসাবে মনে করে। সবচেয়ে বড় আর্ন্তজাতিক দলের একটি সম্প্রতি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম ব্রাদার হুড ও আরেকটি হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী হিযবুত তাহরির। সালাফিপন্থি বা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে আহলে হাদিস হিসেবে পরিচিত আছে কিছু দল। এই আহলে হাদিসপন্থি অধিকাংশ দলগুলোও গণতন্ত্রকে একটি কুফরি মতবাদ মনে করে। আল-কায়দার মতো সশস্ত্র দলগুলোকে আলোচনায় আনলেও বলতে হয়—এগুলোর অধিকাংশ গণতন্ত্রকে মুসলিমদের জন্য হারাম মনে করে। এছাড়া সাধারণ ধার্মিক মুসলিমদেও প্রায় ৯০ ভাগের ও বেশি মানুষ খুলাফায়ে রাশিদার শাসন ব্যাবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যাবস্থার মডেল হিসেবে মনে করেন। হযরত মুহম্মদ (সা.) ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী খিলাফত ব্যাবস্থা আবার ফিওে আসবে। মুসনাদে আহমদ শরীফের সহীহ হাদীস—আবার খিলাফত ফিরে আসবে নবুয়্যতের আদলে। বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখতে গেলেও তা কোনোভাবেই উমাইয়া, আব্বাসীয় ও

উসমানীয় খিলাফতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। ইসলামের প্রকৃত রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো খিলাফত আমলের রাজনীতি বা খুলাফায়ে রাশিদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় মডেল *[তাফসীর ইবনে কাসির, খ. ১০]*। পশ্চিমা গ্রীকিয় গণতন্ত্র বা আইন প্রণয়নে মানুষের সার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র পশ্চিমা বিশ্বে রাসুল (সা.) ও তাঁর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেইনদের সময়েও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই আদর্শ তারা কখনো রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে জনগণের প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন বা মনোনয়োন দুইই ইসলাম অনুমোদন দেয়। কিন্তু, রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুমোদন ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কারণ, সাহাবীরা ও পরবর্তী খলিফাগণ জানতেন ইসলামী ব্যবস্থাকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ খিলাফত ব্যবস্থা উসমানীয় খিলাফতও টিকে ছিল আধুনিক গণতন্ত্রের জয়জয়াকারের মধ্যে। ১৯২০ সালে এর ভাঙ্গনের প্রান্ত বেলায়ও উসমানীয় খিলাফতের খলিফা ব্রিটেন-ফ্রান্সের চাপের মুখেও গণতন্ত্র বাস্তবায়নে নারাজ ছিলেন। ১৯২০ সালে উসমানীয় খিলাফত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ায় বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষ খিলাফত আন্দোলন করেছে। তাই প্রায় সকল সুন্নিপন্থিই দল খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে ইসলামী মূলধারার রাজনীতি মনে করে। গণতন্ত্র যেমন কোনো দলের বিষয় নয়, খিলাফত ব্যবস্থাও কোন ব্যক্তি বা একটি ইসলামী দলের বিষয় নয়।

আরব বিশ্বে মুসলিম তরুণরা স্বৈরতন্ত্রের জিঞ্জির হতে মুক্তির জন্য যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল সে মুক্তির স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তারা চরমপন্থার দিকে পা বাড়াতে পারে। ব্রাদারহুড তথা মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর সামনেও বড় প্রশ্ন থাকবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচন কী তাদের ইসলামি সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি? নাকি পশ্চিমা সেকুলার পুঁজিবাদী বিশ্ব চায়, ইসলামপন্থিরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করুক কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ইসলামি আদর্শ যেন বাস্তবায়ন না করে। হাজার বছরের ক্রুসেডের বারং বার যুদ্ধ ও পরাজয়ের ইতিহাসও হয়তো পশ্চিমারা ভুলতে পারে না। তাদের ধারণা সেকুলার পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ধর্মভিত্তিক মুসলিম সমাজে হয়তো মানিয়ে উঠতে পারবে না। তাই মুসলিমবিশ্বের ১৪০০ বছরের ভিন্ন সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নিরিক্ষে পশ্চিমার হয়তো ইসলামপন্থি দলগুলোকে সমর্থন দিতে সংকোচ বোধ করে। ঐতিহাসিক ও আর্দশিক এ দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা মনে হয় ইসলাম ও পুঁজিবাদী সেকুলার গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কের রূপ নির্ধারণ করবে।

লেখক: লেখক ও মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিষয়ক এম.ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা

- সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়।
- প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
- অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়।
- ১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে।
- এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না।
- মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন বাড়ানো হয়।
- পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়।

আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা

- সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয়।
- গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা প্রদান করতে হবে।
- গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক-যোগে পাঠানো হয়।
- দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা ২৫০ টাকা।
- দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত।

Subscription in abroad...

Country	Reg.post	General post
India, Pakistan, Bhutan, Nepal	Tk.1370	Tk.750
KSA, UAE, Qatar, Oman, Iran, Iraq, Kuwait, Afghanistan, etc. Asian countries.	Tk.1700	Tk.1100
European & African Countries.	Tk.2200	Tk.1600
North America	Tk.2550	Tk.1900
Australia.	Tk.1800	Tk.1160

যোগাযোগ

আততাওহীদ

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা)
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
০১৮১৫-৮৪৭০৭০

[আমাদের নামাযে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুন্নাহর আলোকে আমাদের নামায নবী করীম ﷺ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেননা নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ: 'তোমরা নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ।'[১] এই নির্দেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত। আমাদের নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল। সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পর্যালোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য করণের লক্ষ্যে 'মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।]

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে

মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান □ □ □

৯ম পর্ব

নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের মতানুসারে নামাযের বিধানসমূহ পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআলা। যাতে হানাফী মতাবলম্বী সাধারণ লোকদের মন পরিস্কার হয় এবং মুসলিম সমাজ যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে নাকি নিম্নস্বরে?

'আমীন' শব্দের অর্থ: اسْتَجِبْ دُعَاءَنَا (আমাদের দুআ কবুল করুন)। فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ (আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের পথে নয়)। 'আমীন' বা এমনটাই হোক। অথবা لَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا (হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাশ করবেন না)।

ইমাম সুরা আল-ফাতিহা সমাপ্ত করার পর অল্পক্ষণ নিশ্চুপ থাকবেন, যাকে হাদীসে 'সিকতা' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ সময় ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে 'আমীন' বলবে। তবে উত্তম পন্থা হল, আমীন অনুচ্চ স্বরে বলা। কেননা আমীন হল একটি দুআ অথবা যিক্‌র, যা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে অনুচ্চস্বরে পড়াই উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক বিনয়ী হয়ে ও গোপনে। তবে তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[২]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন যে,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে, বিনয়ী হয়ে ও সংগোপনে এবং অনুচ্চস্বরে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৩]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: رَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ».

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মানুষ উচ্চৈঃস্বরে দুআ করল, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন যে, 'হে লোক সকল! তোমরা স্বীয় নফসের ওপর নরম কর। কেননা তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি শুনেন না কিংবা তোমাদের থেকে দূরে। নিশ্চয়ই তোমরা যাকে ডাকছ তিনি মহাশ্রবণকারী ও অতি নিকটে।'[৪]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ [الفاتحة]، فَقَالَ: «آمِيْنَ» وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

হযরত ওয়ায়িল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী কিরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'গাইরিল...' পড়ে 'আমীন' বললেন এবং আস্তে আওয়াজ করে বললেন।[৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, 'যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানের ফিরিশ্তাগণও আমীন বলেন, আর তা পরস্পরের সাথে মিলে যায়, তখন তার পূর্ববর্তী সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ [الفاتحة]، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, 'তোমরা ইমাম থেকে অগ্রগামী হবে না। ইমাম যখন তাকবীর দেয় তোমরাও তাকবীর দেবে এবং ইমাম যখন 'ওয়ালায যাল্লীন' বলে তোমরা 'আমীন' বলবে। আর ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে, তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলবে।'[৭]

১. এই হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুক্তাদীদের করণীয় বর্ণনা করেছেন। ইমামের সাথে তাকবীর বলা।
২. ইমাম সাহেব ওয়ালাজ জাল্লিন বললে মুক্তাদীদের আমীন বলা।
৩. ইমাম সাহেব সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বললে মুক্তাদীদের রাব্বানা লাকাল হামদু বলা।

এসব করণীয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব তাকবীর, ওয়ালায যাল্লীন ও সামিআল্লাহু জোরে বলে। কিন্তু মুক্তাদীরা এর উল্টা তাকবীর, আমীন ও রাব্বানা লাকাল আস্তে বলবে। কেননা যদি আমীনের হুকুম তাকবীর ও রাব্বানা লাকাল হামদু থেকে ভিন্ন হত, তাহলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তা নির্দেশ করতেন। সুতরাং আমীন অনুচ্চস্বরে পড়াই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে উত্তম।

হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হযরত আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ কথা বর্ণিত যে, তাঁরা আমীন জোরে বলতেন না। সম্ভব এ কারণে হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন,

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعٌ يُخْفِيْهُنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَالْاِسْتِعَاذَةِ، وَآمِيْنَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

চারটি বিষয়ে ইমাম সাহেব আস্তে পড়বেন। বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ, আমীন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদার উত্তরে রাব্বানা লাকাল হামদু।[৮]

সারমর্ম হল: আমীন উচ্চ ও অনুচ্চস্বরে উভয় পদ্ধতিতে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে অনুচ্চস্বরে পড়াই উত্তম এবং এর ওপরই আমাদের এই অঞ্চলের মুসলমানদের আমল প্রচলিত হয়ে আসছে। সুতরাং আমীন অনুচ্চস্বরে পড়াকে সুন্নাহ-পরিপন্থী বলার কোন অবকাশ নেই। যেমনটা কিছু কিছু লোকের পক্ষ হতে প্রচার করা হয়। তবে যেহেতু এটা কোন জায়েয না-জায়েযের বিষয়ও নয়, বরং উত্তম বা অনুত্তমের বিষয়। তাই কেউ জোরে আমীন বললে তার প্রতি ভিন্নদৃষ্টিতে তাকানো বা তার সমালোচনা করারও অবকাশ নেই। তবে তা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নিয়তে না হতে হবে। যা হোক, এ বিষয়টা নিয়ে পরস্পর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তো করা যায়, তবে সাধারণ মুসলমানদের প্রচলিত আমলপরিপন্থী প্রচারণা ও তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি প্রচারমূলক কোন কাজ করা মোটেই বৈধ হতে পারে না।

সুরা মিলানো

সুরা আল-ফাতিহা পড়ার পর ইমাম ও একা নামায আদায়কারী অন্য একটি সুরা কিংবা একটি বড় আয়াত বা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করবে। যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাআতে এবং ফজর নামাযে এটি ওয়াজিব।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا».

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, 'যে নামাযে সুরা আল-ফাতিহা এবং অতিরিক্ত সূরা পাঠ করে না, তার নামায হয় না।'[৯]

সুতরাং সুরা আল-ফাতিহার সাথে অতিরিক্ত কোন সুরা বা একটি বড় আয়াত বা ছোট ছোট তিনটি আয়াত না পড়লে নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্যত্র বর্ণিত,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যুহরের প্রথম দু'রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহার সাথে দু'টি সুরা মিলাতেন এবং শেষ দু'রাকাআতে শুধু সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করতেন। কোন কোন সময় আয়াত পাঠ করে আমাদেরকে শোনাতেন। প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআত থেকে লম্বা করতেন। আসর ও ফজরের নামাযও এভাবে আদায় করতেন।[১০]

উচ্চ ও অনুচ্চস্বরে কিরাআত সম্পর্কে

ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকাআতে ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বেন। তেমনিভাবে জুমা, দুই ঈদের নামায, ইস্তিজকা ও বিতর নামাযের প্রথম দু'রাকাআতেও। তা ছাড়া যুহর ও আসর নামাযে সর্বদা নিম্নস্বরে কিরাআত পড়বেন। হাদীসে পাকে বর্ণিত,

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ، وَيَقْرَأُ بِالطُّوْرِ».

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়াচ্ছিলেন তখন আমি মানুষের পেছন দিক থেকে ঘুরে আসলাম এবং তাতে তিনি ﷺ সুরা আত-তূর তিলাওয়াত করছিলেন।[১১]

عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، قُلْتُ لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ».

হযরত আবু মা'মার থেকে বর্ণিত, আমি হযরত খব্বাব ﵁-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ কি যুহর ও আসর নামাযে কিরাআত পড়তেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি কিভাবে তা অবগত হলে? তিনি উত্তর দিলেন, কারণ তাঁর দাড়ি নড়াচড়া করায় অবগত হয়েছি।[১২]

কিরাআত শেষে সামান্য অপেক্ষা

কিরাআত শেষ করার পর অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিজস্ব গতিতে ফিরে আসে এবং শরীর স্বাভাবিক হয়ে যায়।

হাদীসে পাকে বর্ণিত, হযরত সামুরা ﵁ বলেন, আমার মনে নবীজির ﷺ দুটি সিকতা বা নীরব থাকা স্মরণ আছে। হযরত কাতাদা ﵀ বলেন, এর মধ্যে থেকে একটি হল যখন তাকবীর বলে নামাযে প্রবেশ করতেন এবং অপরটি হল যখন কিরাআত পাঠ শেষ করতেন।[১৩]

রুকু ও রফয়ে ইয়াদাইন

কিরাআত শেষে তাকবীর বলতে বলতে রুকু করবে। তবে রুকুতে যাবার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন বা তাহরীমার ন্যায় পুনঃ হাত উঠাবে না। এটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এটিই উত্তম ও প্রধানযোগ্য মত।

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: أَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَّىٰ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পড়াব (শিক্ষা দেব) না? অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং শুধু প্রথমবার ব্যতীত কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করেননি।[১৪]

ইমাম তিরমিযী ﵀ এই হাদীসটিকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে অভিহিত করে বলেন, অনেক সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন এই মত গ্রহণ করেছেন।

[চলবে]

পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, দারু তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﵁ থেকে বর্ণিত: «وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ».

[২] আল-কুরআন, ***সূরা আল-আ'রাফ***, ৭:৫৫

[৩] আল-কুরআন, ***সূরা আল-আ'রাফ***, ৭:২০৫

[৪] (ক) ইবনে কসীর, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪ ও ৩৮৭; (খ) আল-বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস: ২৯৯২; (গ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২০৭৬, হাদীস: ৪৪ (২৭০৪)

[৫] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস: ২৪৮

[৬] (ক) আল-বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৭৮১; (খ) মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ৭৫ (৪১০)

[৭] মুসলিম, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৭৮ (৪১৫)

[৮] আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, ***আল-মুসান্নাফ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: ২৫৯৬

[৯] আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: ৮২২

[১০] আল-বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৭৭৬

[১১] আল-বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১৫৪

[১২] আল-বুখারী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৭৭৭

[১৩] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ৩০–৩১, হাদীস: ২৫১

[১৪] আত-তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ৪০, হাদীস: ২৫৭

কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ধর্মীয় কাজ তথা ইমামত, ওয়ায-নসীহত, ইসালে সওয়াব ও খতমে তারাবীহের বিনিময়

আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইমামত ও তা'লিমে কুরআনের বিনিময়

যথাযথভাবে ধর্মীয় কাজ পালন করে বিনিময় নেয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে এটা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা এবং সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে তা নাজায়েয। কেননা হাদীসে পাকে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْ «اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَّا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا».

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাযি.) বলেন, নবীয়ে আকরম (সা.) আমাকে সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে, 'যদি তুমি কাউকে মুয়াজ্জিন নিয়োগ কর, তাহলে সে যেন আযানের বিনিময় গ্রহণ না করে।'[১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، لَا تَأْكُلُوا بِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, 'তোমরা কুরআন পড়, তবে একে রুজির মাধ্যম বানিওনা।'[২]

কিন্তু আহনাফের পরবর্তী ফকীহগণ যখন লক্ষ করলেন যে, ইসলামি শাসন দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে কুরআন শিক্ষা বিতরণকারীদের রাষ্ট্রিয় কোশাগার থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষকরা অন্য কোন পেশায় জড়িয়ে পড়লে কুরআন শিক্ষার এই ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাই তারা অতীব প্রয়োজনের ভিত্তিতে শাফিয়ী মাযহাব মতে কুরআন শিক্ষার ওপর বিনিময় নেওয়াকে বৈধ বলেছেন এবং এর সাথে আযান-ইমামত, ফিকহা ও হাদীস শিক্ষাকেও যুক্ত করেছেন।[৩]

ইমাম সারাখসী (রহ.) উল্লেখ করেন, বলখের কতিপয় আয়িম্মা ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতকে গ্রহণ করে তা'লিমে কুরআনের ওপর বিনিময় গ্রহণকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। যাতে ইলমে দীন বিলুপ্ত না হয়, বরং উজ্জীবিত থাকে। এটা এমনই যে, নবী করীম (সা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর যুগে মহিলারা নামাযের জামাতে শরিক হত, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাযি.) তাকে নিষেধ করেছেন।[৪]

ওয়ায-নসীহতের বিনিময়

ওয়ায-নসীহত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে আম্বিয়া (আ.)-এর আদর্শ হচ্ছে তাঁরা মানুষের কাছ থেকে এর কোন বিনিময় গ্রহণ করতেন না। কুরআন মজীদে প্রায় সকল নবীগণের প্রচারিত এ উক্তি একাধিকবার বর্ণিত রয়েছে যে,

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۭ

‘হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।’[৫]

ওয়ায-নসীহত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বিনিময়ের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে পয়গাম্বরী শিষ্ঠাচার। যার ওপর আমাদের পূর্বসূরিরা দৃঢ়ভাবে আমল করে ছিলেন। তারা ওয়ায-নসীহতের ওপর বিনিময় নিতে সর্বদা অস্বীকার করতেন। এ ব্যাপারে একটু পরেই হযরত আবু হাযেম (রহ.)-এর ঘটনা প্রত্যক্ষ করবেন। কিন্তু পরবর্তী ফকীহগণ যারা অতীব প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা’লিমে কুরআন, আযান-ইকামত ও ইমামত, তা’লিমে হাদীস ও ফিকহার বিনিময়কে বৈধ বলেছেন, তাদের কেউ কেউ ওয়ায-নসীহতকেও একই হুকুমে যুক্ত করেছেন, আবার কেউ কেউ এর বিরোধিতাও করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে হালাল আয়ের ওপর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও শুধু দীনের কল্যাণে ওয়ায-নসীহতকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে অথবা কোন সংস্থা, সংগঠন কিংবা কোন মাদরাসার পক্ষ থেকে তাকে এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে তার জন্য ওয়ায-নসীহতের ওপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। ব্যক্তিগতভাবে এ পেশা গ্রহণ করলে দাওয়াতকারী থেকে এবং কোন সংস্থার পক্ষ হতে নিযুক্ত হলে সংস্থা থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবেন। এ ছাড়া অপেশাদার কোন আলেমের নিকট যদি ঘটনাক্রমে ওয়ায করার সুযোগ এসে যায় বা কোন মাদরাসা, মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কোন আলেম যদি কারো আবেদনের ভিত্তিতে ওয়ায করে, তাহলে তার জন্য ফিস ও বিনিময় তলব করা না-জায়েয। কেননা তখন এটা নির্ভেজাল ইবাদতের বিনিময় সাব্যস্ত হবে, যা সকলের ঐক্য মতে নাজায়েয। তবে এমতাবস্থায় ওয়ায়েয পথ খরচ দাবি করতে পারবে।

এ ছাড়া যদি পূর্ব হতে কোন বিনিময় শর্ত করা না হয় এবং ওয়ায়েযের অন্তরেও এর কোন চাহিদা না থাকে, তবে দাওয়াতদাতা ওয়ায়েযের জ্ঞান, খোদাভীতি, বুযুর্গী ও আন্তরিক ভালবাসার টানে হাদিয়া হিসেবে কিছু প্রদান করে, তখন তা গ্রহণ করা জায়েয আছে। এ ব্যাপারে অধমের লিখিত পুস্তিকা *ওয়ায-নসীহতের বিনিময় শরীয়ত কি বলে?* প্রত্যক্ষ করুন। যাতে সুবিস্তারে আলোচনা পরিবেশন করা হয়েছে।

ইসালে সওয়াবের বিনিময়

পূর্বে তা’লিমে কুরআন, আযান ও ইমামত ইত্যাদির ওপর বিনিময় নেওয়াকে পরবর্তী ফকীহগণ বৈধ ঘোষণা করেছেন, এর কারণ হচ্ছে একটি অতীব ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করা, যাতে ত্রুটি হলে দীনের পুরো নেজামের ওপর আঘাত আসার সম্ভাবনা ছিল, তা থেকে উত্থরনের জন্য উক্ত বিষয়াদির বিনিময়কে বৈধ বলা হয়েছে। সুতরাং যেখানে এ ধরণের ধর্মীয় প্রয়োজন নেই, সেখানে এই হুকুম প্রয়োগ করা ভুল। এ কারণে হযরাতে ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন কিংবা অন্য কোন অযীফা পাঠ করে বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয। তাই এভাবে দুআআ পাঠকারী এবং দাওয়াতদাতা উভয়ে গুণাহগার হবে। আর মৃত ব্যক্তির নিকট কোন সওয়াবও পৌঁছবে না।[৬]

খতমে তারাবীহের বিনিময়

তারাবীহের নামাযে কুরআন করীম খতম করা সুন্নাত ও একটি ফযীলতময় কাজ। সামর্থ থাকলে রামাযানের রজনীতে এই সুন্নাত আদায় করা উচিত, বিরত থাকা বা অবহেলা করা অনুচিত। কিন্তু এমন জরুরিও নয় যে, যদি কোন হাফেয সাহেব স্বেচ্ছায় বিনিময়বিহীন পড়াতে আগ্রহী না হয়, তাহলে তাকে বিনিময় দিয়ে কুরআন খতমের এই সুন্নাত আদায় করতে হবে। অধিকন্তু বিশুদ্ধ হাদীসে কুরআন খতমসহ অন্যান্য ইবাদতের ওপর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধও করা হয়েছে।

রামাযানের রজনীতে কুরআন করীম খতম করা যেভাবে মুসল্লিদের জন্য সুন্নাত, তেমনিভাবে হাফেযদের জন্যও সুন্নাত। তবে হাফেয সাহেব তারাবীহের মাধ্যমে এই সুন্নাত সরাসরি পালন করছেন এবং অন্যান্য মুসল্লিরা পরোক্ষভাবে শ্রবণের মাধ্যমে। সুতরাং নিজের সুন্নাত পালন করে অপরের কাছ থেকে তার বিনিময় গ্রহণ করার কোন অর্থ নেই। এ কারণে হাদীসে পাকে যাবতীয় ইবাদত পালনের ওপর কোন ধরনের বিনিময় গ্রহণকে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ الله ﷺ: أَنْ «اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا».

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাযি.) বলেন, নবীয়ে আকরম (সা.) আমাকে সর্বশেষ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে ‘যদি তুমি কাউকে মুয়াজ্জিন নিয়োগ কর, তাহলে সে যেন আযানের বিনিময় গ্রহণ না করে।’[৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، لَا تَأْكُلُوا بِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, ‘তোমরা কুরআন পড়, তবে একে রুজির মাধ্যম বানিওনা।’[৮]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ، وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ الله ﷻ، لَآتِيَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله! رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيْلِ الله، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) বলেন, সুফ্ফাবাসীদের কতিপয় লোককে আমি লিখনী ও কুরআন করীম শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া প্রদান করল। এটা তো কোন উল্লেখযোগ্য মাল নয় এবং আমি তা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করব। তবে আমি প্রথমে নবী করীম (সা.) থেকে এর হুকুম জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর আমি নবীজির কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করছি যে, এক ব্যক্তি যাকে আমি কুরআন এবং লিখনী শিখিয়েছি, সে আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া প্রদান করেছে, যা কোন উল্লেখযোগ্য মাল নয় এবং তা দিয়ে আমি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করব। তখন নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন, 'যদি তুমি আগুনের কোন হার পরিধান করতে চাও, তাহলে তা গ্রহণ কর।'[৯]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ».

হযরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে মানুষের কাছ থেকে জীবিকা তালাশ করে, কিয়ামত দিবসে সে উপস্থিত হবে, তবে তার চেহেরায় হাড্ডি ব্যতীত গোশত বলতে কিছু থাকবে না।'[১০]

হযরত আবু আয়াস মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ বলেন, আমি আমর ইবনে নু'মান ইবনে মুকরিনের নিকট ছিলাম, যখন রামাযান মাস আসল, তখন মুসআব ইবনুয যুবাইরের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি দুই হাজার দিরহাম নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, বসরার আমির মুসয়াব ইবনে যুবাইর আপনাকে সালাম বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, আমরা সম্মানিত কারী সাহেবকে সম্মানী দিয়ে থাকি। সুতরাং আপনি এই দু'হাজার দিরহাম দিয়ে এই মসের খরচ চলান। আমর বলেন, আমিরকে আমার সালাম বলবেন এবং বলবেন যে, আল্লাহর কসম! দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আমরা কুরআন শরীফ পড়ি না। উক্ত দিরহাম তার কছে ফেরত দেন।[১১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِحُلَّةٍ وَبِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْخُذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রামাযান মাসে লোকদেরকে নামায পড়ালেন। যখন ঈদের সময় আসল, তখন ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ একটি স্বর্ণের গহনা ও পাঁছ হাজার দিরহাম পাঠালেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযি.) বললেন, নিশ্চই আমরা কুরআনের কোন বিনিময় গ্রহণ করি না।[১২]

সুতরাং তারাবীহের নামাযে কুরআন শোনানো একটি ইবাদত হিসেবে এর বিনিময় গ্রহণ করা শর্তসাপেক্ষে হোক কিংবা শর্তবিহীন প্রথা হিসেবে, তা অর্থ আকারে প্রদান হোক কিংবা অন্য কোন রূপে, বিনিময়স্বরূপ যাই প্রদান করা হবে সবই না-জায়েয। উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় এবং এটিই হানাফী ইমামদের মতামত। তবে ইমামত, মুয়াজ্জিন, তা'লিমে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি তারাবীহে খতমে কুরআনের ব্যতিক্রম বিধায় তাতে বেতন-ভাতা গ্রহণ করা বৈধ, যার কথা একটু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু যদি কোথাও কুরআন শোনানোর বিনিময় নির্ধারণ করা না হয় এবং বিনিময় প্রদানের কোন প্রথাও সেখানে না থাকে, বরং হাফেয সাহেব রেযায়ে মওলার উদ্দেশ্যেই কুরআন শোনায় এবং তার অন্তরেও বিনিময় গ্রহণের কোন ইচ্ছে থাকে না, তবে তা সত্ত্বেও যদি কেউ হাফেয সাহেবকে কোন হাদিয়া প্রদান করে থাকে, তাহলে তা উপঢৌকন সাব্যস্ত হবে এবং কুরআন শোনানোর বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না বিধায় তা গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে এ ক্ষেত্রেও কোন সময় ও জিনিসকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। যেমন– শুধু খতমের শেষে প্রদান করা হবে অথবা হাদিয়া শুধু অর্থাকারে প্রদান করা হবে। যাতে হাফেয সাহেবের অন্তরে হাদিয়ার প্রতি কোন ধরনের অপেক্ষার প্রবণতা বা হাদিয়া না দেওয়ার ওপর অনুশোচনা দেখা না যায়। *[চলবে]*

---

[১] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ১, পৃ. ৪০৯–৪১০, হাদীস: ২০৯

[২] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল আ'ওসাত***, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৮, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৮৮২৩

[৩] ইবনে আবিদীন, ***রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার***, এইচএম সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৬, পৃ. ৫৫

[৪] আস-সারাখসী, ***আল-মবসূত***, খ. ৬, পৃ. ৪১

[৫] আল-কুরআন, ***সূরা হুদ***, ১১:৫১

[৬] (ক) ইবনে আবিদীন, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ২৪০; (খ) বদরুদ্দীন আল-আইনী, ***আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া***, খ. ৩, পৃ. ৬৫৫; (গ) মোল্লা আলী আল-কারী, ***মানহুর রাওযিল আযহার ফী শরহিল ফিকহিল আকবর***, পৃ. ১৬০; (ঘ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, ***মা'আরিফুল কুরআন***, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, পাকিস্তান (১৪০৩ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৮

[৭] আত-তিরমিযী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ১, পৃ. ৪০৯–৪১০, হাদীস: ২০৯

[৮] আত-তাবারানী, ***প্রাগুক্ত***, খ. ৮, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৮৮২৩

[৯] আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৩৪১৬

[১০] আল-বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, খ. ৪, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ২৩৮৪

[১১] ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৭৭৩৮ ও খ. ৬, পৃ. ১২৫, হাদীস: ৩০০০৫ ও পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩০৬৪৭

[১২] ইবনে আবু শায়বা, ***প্রাগুক্ত***, খ. ২, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৭৭৩৯

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

কুতবুল আলম হাকীমুন নফস আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহি আলায়হি

ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী

১৩৬১ হিজরী অনুযায়ী ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা হাবীবুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইন্তিকাল করেন। এরপর থেকে শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি উম্মুল মাদারিস (Mother of all Islamic Colleges/Institutions in this country)-এর হাল ধরেন। ০৯ শা'বান ১৪০২ হিজরী মোতাবেক ০২ জুন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বুধবার সন্ধ্যা ৬.২০ টায় হাকীমুন নফস শাহ আবদুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহি আলায়হি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে চলে যান। চলে যাওয়ার পূর্বে তিনি সর্বমোট ৪০ বছর ৭ মাস ২৩ দিন (প্রায়) ইহতিমামের দায়িত্বে ছিলেন।[১] এ সুদীর্ঘ সময়টি শাহ যুগ হিসেবে খ্যাত। এই শাহ যুগে দারুল উলূম হাটহাজারীর অসাধারণ উন্নতি ঘটে এবং উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।[২] একটি মাদরাসা পরিণত হয় জাতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৩] এ কারণে উক্ত শাহ যুগকে দারুল উলূম হাটহাজারীর স্বর্ণযুগও বলা হয়ে থাকে।[৪] এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হলো জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ মানানসই বঙ্গানুবাদ।[৫]

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্নে দারুল উলূম হাটহাজারীর নাম ছিল মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম। এ নামটি সংস্কার করে মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি নতুন নামকরণ করেন, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম।[৬] আলহামদুলিল্লাহ এ নামকরণ-শৈলী এতই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে যে, এ মুসলিম দেশের দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় প্রায় মাদরাসার নামকরণ করা হয়েছে এ শৈলীর অনুকরণে যার বেশ কয়েকটির নামকরণ করেছেন শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজেই।[৭]

আল্লামা হাবীবুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ব্রেইন ট্রাস্ট মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বপ্রথম দাওরা-উত্তর বিশেষায়িত পড়াশোনা ও গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে তাঁর এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ তিনি মূলকেন্দ্র হাটহাজারীতে সকল বিভাগ না খুলে বিশ্বস্থ, যোগ্য ও দক্ষ জনবল তৈরি করে অন্যান্য মর্যাদাসম্পন্ন মাদরাসায় বিভিন্ন বিভাগ চালু করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় দারুল উলূম হাটহাজারীতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফতওয়া বিভাগ[৮], ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ[৯], ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাফসীর বিভাগ[১০], ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কিতাবত বিভাগ[১১], ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কারিগরী প্রশিক্ষণ বিভাগ চালু হয়।[১২] পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই চিন্তা ও চেতনার ফলাফল হিসেবে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ১৯৫২ ঈ. সনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ[১৩], ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কিরআত বিভাগ[১৪] এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বাবুনগর মাদরাসায় উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ চালু হয়।[১৫]

উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দারুল উলূম হাটহাজারীতে মক্তব বিভাগ ও তাজবীদ বিভাগ চালু ছিল। এরপর ১৯০৭ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদীস বিভাগ চালু করা হয়– যা উভয় বাংলা, আসাম ও মিয়ানমারের সর্বপ্রথম দাওরায়ে হাদীস, আরো পরে তিরিশের দশকে হিফয বিভাগ চালু হয়।[১৬]

দেশ ও জাতির অবিসংবাদিত অভিভাবক শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৭০-এর দশকে শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্রসহ আপামর জনতার চিকিৎসার জন্য অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হেকিমি—এই তিন চিকিৎসাপদ্ধতির বিজ্ঞ চিকিৎসক-হেকিম নিয়োগ দেন।[১৭] অ্যালোপ্যাথি তথা আধুনিক চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁরই বড় জামাতা ডা. নুরুল হক রহমাতুল্লাহি আলায়হি। হেকিমি বিভাগ পরিচালান করতেন মাওলানা আবদুল হক বরিশালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।[১৮] এরই ক্রমানুসারে পরবর্তীতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ইসলামি চিকিৎসা-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'কমিউনিটি

হেলথ ওয়ার্কার্স (CHW) ট্রেনিং' চালু হয়।[১৯] বিশ্বখ্যাত চিকিৎসালয় ঢাকার বারডেম (BIRDEM) হাসপাতাল ও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস)-এর প্রসিদ্ধ শ্লোগান হলো: 'শৃঙ্খলাই জীবন'। উভয় প্রতিষ্ঠানের জনক ডা. মুহাম্মদ ইবরাহীম ১৯৪৭/১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ও চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সেই সময় শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ অসুস্থ হয়ে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা করতে গিয়ে ডা. সাহেব তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার অনন্য সুযোগ লাভ করেন। খুব অসুস্থতা সত্ত্বেও শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন, নিয়ামুনাবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে ভারসাম্যপূর্ণতা, চিকিৎসকদের সুপরামর্শের যথাযথ মূল্যায়ন ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে তিনি যারপরনাই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। শৃঙ্খলাই যে সুস্বাস্থ্য ও জীবনসাফল্যের মৌলিক ভিত্তি—এ সত্য আরও গভীরভাবে ব্যপ্ত হয় তাঁর মাঝে। চিকিৎসার পরতে পরতে পরস্পরের হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপচারিতায় 'মানবদেহ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান' বিষয়ে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর গভীর জ্ঞান তাঁকে বিস্মিত করে। ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার মূল কথা হিসেবে নন্দিত এই বিখ্যাত শ্লোগানের জন্ম কিন্তু সেই সান্নিধ্য থেকে। মানবতার জন্য কিছু করে জীবনের জন্য 'সাদকায়ে জারিয়া' হিসেবে কিছু রেখে যাওয়ার প্রেরণাও তিনি লাভ করেছিলেন সেই ঘটনা থেকে। যার ফসল হিসেবে আমরা আজ বারডেম ও বাডাস দেখতে পাচ্ছি।[২০]

আকাবিরে হাটহাজারীর স্বপ্নপূরণে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক আলিম মাওলানা আবুল ফারাহ রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পাদনায় *ইসলামপ্রচার* নামে একটি মাসিক প্রকাশ করতে থাকেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ হতে।[২১] প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন-বিষয়ক সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা যার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় দীনের প্রচার ও প্রসার। পরবর্তীতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর দিকনির্দেশনায় এটি *মাসিক মঈনুল ইসলাম* হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে আরও পূর্ণাঙ্গ অবয়বে। এর কয়েক বছর আগে তাঁরই কয়েকজন আস্থাভাজন, সৃজনশীল ভক্তদের সাথে নিয়ে ঢাকায় *দৈনিক পাসবান* প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যোগ্য লেখক-গবেষক তৈরির মিশন সামনে রেখে।[২২] পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় লেখালেখির ময়দানে ওলামা-মাশায়েখ ও তালিবানে ইলমের পদচারণা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে বর্তমানে আমরা প্রতিমাসে ৩০টিরও অধিক মানসম্মত দীনী পত্র-পত্রিকা মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। তালিবানে ইলমের চিন্তা-চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার মানসে তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংঘ আন-নাদী আস-সাকাফী গড়ে তোলেন। জামিয়ার তৎকালীন শায়খুল আদব আল্লামা নযীর আহমদ আনোয়ারী রহিমাহুল্লাহ ছিলেন এ সংঘের প্রধান সঞ্চালক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রবৃন্দের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানগুলোতে।[২৩]

দীনী বইপত্রের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'একটি লাইব্রেরি থাকলেও অ্যাকাডেমিক বই-পুস্তকের জন্য বিশেষ কোন লাইব্রেরি ছিল না। সেই যামানায় বাংলার শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে হাটহাজারীতে আশরাফিয়া কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিনের এ মৌলিক অভাব পূরণ করেন। অলাভজনক এ লাইব্রেরির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এতে প্রায় সব অ্যাকাডেমিক কিতাব ও তাদের শরাহ উৎপাদনমূল্যে পাওয়া যেত। লেবাননের বয়রুত, মিসর, সৌদি আরব, ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ বছরের শুরুতেই চাহিদা মাফিক বই-পুস্তক পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে তাঁর স্নেহধন্য হযরত সুলাইমান আরমান কাতেব (দা. বা.)-কে দিয়ে নুমানিয়া লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করান।

উল্লেখ্য এ নুমানিয়া লাইব্রেরি নামটি শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর দেওয়া। কয়েক বছরের মধ্যে কাতেব সাহেব (দা. বা.) লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে উঠলে আসাতিজা কেরামের দরদি মুরুব্বী শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজের আশরাফিয়া কুতুবখানাটি বন্ধ করে দেন এবং এর সমুদয় কিতাব জামিয়ার লাইব্রেরিতে দান করেন। পরবর্তীতে কুতুবখানার স্থলে সার্বজনীন ডাক বিভাগ (Post Office) চালু করেন, যা এখনো সেই স্থানে বিদ্যমান আছে। উপরোক্ত শিক্ষণীয় ঘটনায় আমাদের সকলের জন্য ইসারের (Self-sacrifice) দীক্ষা রয়েছে।[২৪]

কুতবুল ইরশাদ মুহতামিমে আযম হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন সমসাময়িক ব্যস্ততম বিশ্বনাগরিকগণের অন্যতম। তাঁর ব্যস্ততা এতো বহুমাত্রিক ছিল যে, মাঝে মাঝে পরিমিত ঘুম বা খাবারের সময়ও তাঁর হয়ে উঠতো না। আন্তরিক ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বই-পুস্তক রচনার জন্য তিনি মোটেই সময় করতে পারেননি। তাই বলে পৃষ্ঠপোষকতা তিনি মোটেও ছাড় দেননি। তাঁরই একান্ত আগ্রহ, নির্মল প্রেরণা ও সুবিন্যস্ত পরামর্শে মুযাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহিমাহুল্লাহ লিখনীর ময়দানে কাজ শুরু করেছিলেন। ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরি ও চট্টগ্রামের ইসলামিয়া লাইব্রেরির অবকাঠামো গঠন ও বিকাশের নেপথ্যে রয়েছে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর যুগান্তকারী দিকনির্দেশনা। এদেশে লিথোপ্রিন্টিং প্রযুক্তির আমদানি, উন্নয়ন ও প্রসারে তাঁর রয়েছে মৌলিক অবদান।[২৫]

আল্লামা আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহ-এর *তানযীমুল আশতাত* রচনার মূল প্রেরণাদায়ক ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন তিনি। ৪০'র দশকের শেষ বছরগুলোতে উম্মুল মাদারিসে কালজয়ী মুহাদ্দিস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত *মিশকাত* শরীফের দরসগুলোর ভিত্তিতে *তানযীমুল আশতাতে*র মূল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়।

উল্লেখ্য সেই বছরগুলোতে হযরত আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহ বৈ শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খলীফায়ে হাকীমুন নফস শায়খুল হাদীস আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহ, মুফতীয়ে আযম আল্লামা আহমদুল হক রহিমাহুল্লাহ, রাঙ্গুনিয়ার বেতাগীনিবাসী আল্লামা সালেহ আহমদ (দা. বা.) প্রমুখ। শেষোক্ত বুযুর্গ এখনও জীবিত আছেন (বর্তমানে হিজরী সন অনুযায়ী তাঁর বয়স প্রায় ১০৭ বছর)। তিনি মুতওয়াক্কিল বিল্লাহ হযরত সমিউদ্দীন রহিমাহুল্লাহ ও মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর একমাত্র জীবিত খলীফা।[২৬] মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফয়যুল কালামে*র রচনা শেষ করলে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজের অর্থায়নে তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

উল্লেখ্য এ গ্রন্থের নামটিও দিয়েছিলেন হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ।[২৭] জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম, হাটহাজারীর ইফতা বিভাগ থেকে প্রদত্ত ফতওয়াগুলোকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। তাঁরই আদেশে আল্লামা আহমদুল হক রহিমাহুল্লাহ ফতওয়াগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। কয়েক মাস পরপর তিনি শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ-কে এ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন।

হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছড়া ও কবিতা পছন্দ করতেন। তিনি একজন স্বভাবকবি (Poet by nature) ছিলেন। তাঁর স্ব-রচিত অনেক কবিতাও ছিল। শুদ্ধ কবিতাচর্চাকে তিনি শুধু উৎসাহিত করতেন না, রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতাও দান করতেন। একটি কাগজে তিনি ১ম ছত্র লিখে দিতেন আর আন-নাদী আস-সাকাফীর সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে ২য় ছত্র তৈরি করতে বলতেন। কেউ সফল হলে তাকে তিনি পুরস্কৃত করে অনুপ্রাণিত করতেন। কেউ ব্যর্থ হলে শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ নিজেই লিখে দিতেন এবং সাথে সাথে বুঝিয়েও দিতেন। তাঁর কাব্যচর্চা ছিল মূলত নৈতিকতাকেন্দ্রিক এবং এর ভিত্তি ছিল তায়াল্লুক মা'আল্লাহ। পটিয়ার মুফতী আযীযুল হক সিদ্দিকী রহিমাহুল্লাহ হাটহাজারী সফরে এলে এই কাব্যচর্চায় বিশেষ মাত্রা যোগ হতো।[২৮]

[চলবে]

---

[১] প্রাবন্ধিকের গবেষণালব্ধ তথ্য

[২] আল্লামা আহমদ শফী (দা. বা.), ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত ভাষণ

[৩] জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেবিনেট সদস্যদের ঐক্যমতে পাশকৃত বিল; ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৯

[৪] *মাসিক রহমত*, এপ্রিল ২০১১

[৫] *সূর্যোদয়*, বার্ষিক সাহিত্য সাময়িকী ২০১২, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩২

[৬] *সাক্ষাৎকার:* আল্লামা আবু জাফর মেখলী সাহেব (দা. বা.)

[৭] *সাক্ষাৎকার:* আল্লামা আবু জাফর মেখলী সাহেব (দা. বা.)

[৮] মুফতী জসীমুদ্দীন, *দারুল উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস*, পৃ. ৮৮

[৯] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ভুজপুরী (দা. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ

[১০] *সাক্ষাৎকার:* আল্লামা সেকান্দর এনায়াতপুরী (দা. বা.), প্রাগুক্ত

[১১] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা সুলাইমান আরমান সাহেব (দা. বা.), প্রাগুক্ত, প্রবীণ উস্তাদ, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

[১২] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা যাকের আহমদ দৌলতপুরী (দা. বা.), মুহতামিম, দারুল উলূম দেয়াং পাহাড়, দৌলতপুর, চট্টগ্রাম

[১৩] ড. আ ফ ম খালিদ (ম. জি. আ.), *মাসিক আলোর পথে*, জুলাই ২০১২

[১৪] *সাক্ষাৎকার:* কারী আবদুল গনী সাহেব (দা. বা.), মুহতামিম, মাদরাসা তারতীলুল কুরয়ান, বখতিয়ার পাড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, খলীফা, হযরত মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালবী রহিমাহুল্লাহ

[১৫] *সাক্ষাৎকার:* আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. বা.), মুহাদ্দিস, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

[১৬] মুফতী জসীমুদ্দীন, *দারুল উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস*, পৃ. ৮৪-৯৭

[১৭] *কথোপকথন*: মাওলানা আহমদ দীদার (ম. জি. আ.), উস্তাদ, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

[১৮] *সাক্ষাৎকার:* হাকীম রশীদ আহমদ রহিমাহুল্লাহ, প্রাগুক্ত

[১৯] মাসউদুল কাদির, *পটিয়ার দশ মনীষী*, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১০

[২০] *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ২৪১-২৪২। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় প্রাবন্ধিকের উদ্ঘাটিত তথ্য।

[২১] মুফতী জসীমুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮, ৭৯

[২২] *সাক্ষাৎকার:* ১. মাওলানা সুলাইমান আরমান সাহেব (দা. বা.), প্রাগুক্ত; ২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. বা.), সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা

[২৩] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা জাকের আহমদ দৌলতপুরী (দা. বা.), প্রাগুক্ত

[২৪] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা সুলাইমান আরমান কাতেব (দা. বা.), প্রাগুক্ত

[২৫] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা সুলাইমান আরমান কাতেব (দা. বা.), প্রাগুক্ত

[২৬] *কথোপকথন:* মাওলানা শুয়াইব বাবুনগরী, উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া আযীযুল উলূম বাবুনগর, চট্টগ্রাম

[২৭] *সাক্ষাৎকার:* মাওলানা আবদুস সাত্তার (দা. বা.) (ফাযেলে হাটহাজারী), বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ; পৃষ্ঠপোষক, মাদরাসা কাশেফুল উলূম খন্দকিয়া, চট্টগ্রাম

[২৮] *সাক্ষাৎকার:* ১. ডা. মাওলানা তালেবুল্লাহ কানাইমাদারী (দা. বা.) (ফাযেলে হাটহাজারী), বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ; ২. মাওলানা হারুন শাহনগরী রহিমাহুল্লাহ (ফাযেলে হাটহাজারী), বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব রহিমাহুল্লাহ

খ্রিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৩. সিয়াম পালন: আরবি সিয়াম বা সাওম অর্থ বিরত থাকা, পরিহার করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা। বাংলায় সমার্থক শব্দ উপবাস। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿١٨٣﴾

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল।'[১]

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যিশু নিজে উপবাস পালন করেছেন, 'আর তিনি (যিশু) চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন।'[২]

৪. যাকাত প্রদান: যাকাত অর্থ পবিত্র করা। ইসলামী পরিভাষায় বছরের উদ্বৃত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব, দরিদ্রকে দেওয়া। কুরআনে নির্দেশ রয়েছে,

وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٤٣﴾

'তোমরা যাকাত দাও।'[৩]

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ঘোষণা দিয়াছিলেন,

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

'তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, ... যাকাত আদায় করিতে।'[৪]

পবিত্র বাইবেলে উপার্জিত অর্থ হতে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করার নির্দেশ রয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে তা কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর।'[৫] 'তিনি (যিশু) তাহাদিগকে কহিলেন, ...আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও।'[৬]

৫. হজ পালন: পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী হজ অর্থ বায়তুল্লাহ যিয়ারতের ইচ্ছা করা বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে পূণ্যভূমি মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ কতগুলি নিয়ম পালন করা। সকল সামর্থ্যবান মুসলিমগণের জন্য হজ করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

'মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য।'[৭]

পবিত্র বাইবেলে যাকোব সদা প্রভু এল বৈথেল (ঈশ্বরের গৃহে) যাবার নির্দেশ লাভ করেন।[৮] এটি ছিল আরাধনার স্থান।[৯] সদা প্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী একত্রে আরাধনার জন্য তীর্থ স্বরূপ পবিত্র শহর উন্মুক্ত করবেন: 'আমি (সদা প্রভু) সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে; আর আমি এই গৃহে প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব।'[১০] আর সারা দিন রাত ঈশ্বরের গৃহ খোলা থাকবে বলা হয়েছে, 'আর তোমার পুরদ্বার সকল সর্ব্বদা খোলা থাকিবে, কি দিন কি রাত্রি কখনও রুদ্ধ হইবে না।'[১১]

অন্যান্য মিলসমূহ

১. জিহাদ: জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহপ্রদত্ত সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿٧٨﴾

'জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত।'[১২]

এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে শুরু করে অস্ত্র ধারণ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরে পরিব্যাপ্ত।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

'যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না।'[১৩]

বাইবেলেও সর্বস্তরে জিহাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন– শয়তানের বিরুদ্ধে: 'ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।'[১৪] যিশু চূড়ান্তভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন এবং তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি নিজেও অস্ত্রধারণের জন্য এসেছেন, 'আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।'[১৫] 'মনে করিওনা যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।'[১৬]

২. মদ্য পান: পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

'হে মুমিণগণ! মদ-জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'[১৭]

বাইবেলে মদ পান নিষিদ্ধ করেছে, তোমরা দ্রাক্ষারস কিংবা মদ্যপান করিওনা।'[১৮] 'ব্যভিচার, মদ ও দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ করে।'[১৯] 'দ্রাক্ষারসে মত্ত হইওনা, তাহাতে নষ্টামী আছে।'[২০]

৩. মূর্তিপূজা: কুরআনে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ ۝

'তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা।'[২১]

বাইবেলেও অবিকল নিষেধ রয়েছে, 'আমার সাক্ষাতে (ব্যতিরেকে) তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিওনা; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিওনা; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিওনা এবং তাহাদের সেবা করিওনা; কেননা তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর।'[২২]

৪. ব্যভিচার : কুরআনে সকল প্রকার ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

'আর যিনার নিকটবর্তী হইওনা, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[২৩]

বাইবেলে ও ব্যভিচার নিষেধ রয়েছে, 'তুমি ব্যভিচার করিওনা। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রী লোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।'[২৪] 'তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ণ কর।মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভুত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।'[২৫]

[চলবে]

লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদরাসা

১ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা (উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৪৪
২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *মথি*, ৪:২, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৫
৩ আল-কুরআন, *সূরা আন-নুর*, ২৪:৫৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০
৪ আল-কুরআন, *সূরা মরয়ম*, ১৯:৩১
৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *মথি*, ৬:১৯–২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৬ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *মথি*, ২২:২০–২১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৭ আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৮ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *আদি পুস্তক*, ৩৫:৪, ৭ ও ১৫
৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *বিচারকর্তৃগণের বিবরণ*, ২০:১৮
১০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *হগয়*, ২:৭
১১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *যিশাইয়*, ৬০:৭, ১১, ১৪
১২ আল-কুরআন, *সূরা আল-হজ*, ২২:৭৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩
১৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৯০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১৪ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *ইফিষীয়*, ৬:১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
১৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *লুক*, ১৯:২৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
১৬ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *মথি*, ১০:৩৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৭ আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৩:৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
১৮ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *লেবীয়*, ১:৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
১৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *হোশেয়*, ৪:১১, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৩০৬
২০ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *ইফিষীয়*, ৫:১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
২১ আল-কুরআন, *সূরা আল-হজ*, ২২:৩০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪
২২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *যাত্রা পুস্তক*, ২০:৩-৫, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১১৪
২৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৩১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
২৪ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *মথি*, ৫:২৮৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭–৮
২৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *১ করিন্থীয়*, ৬:১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

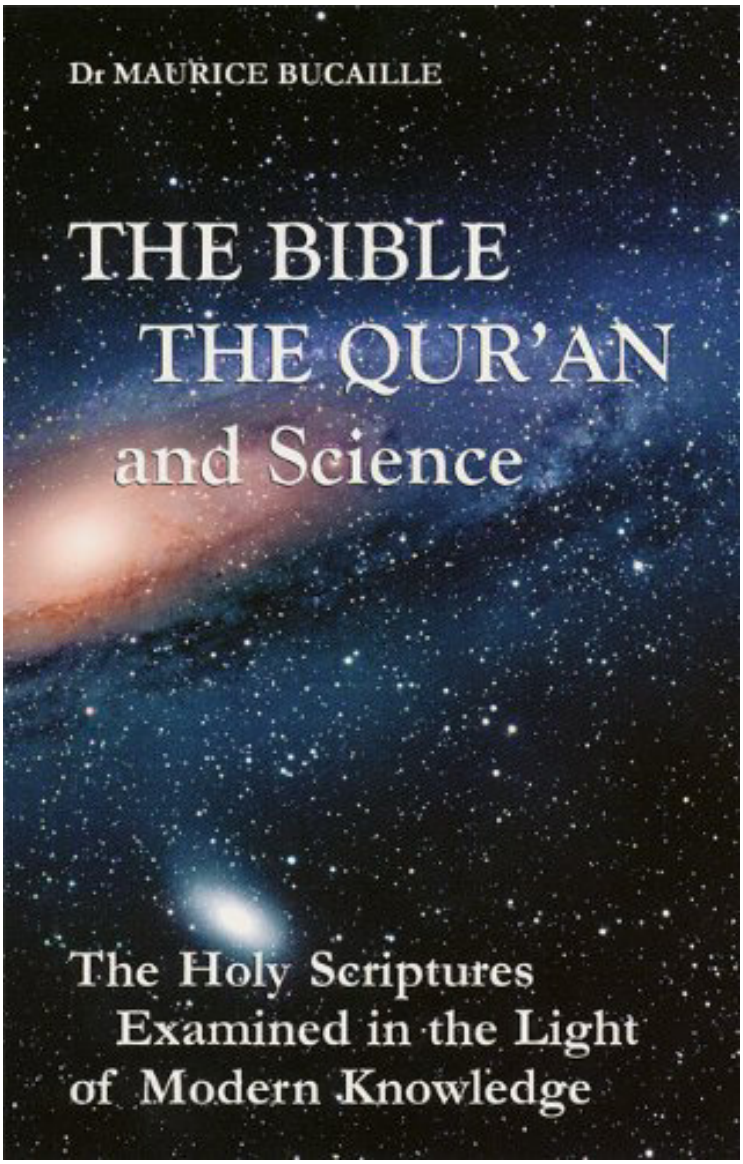

ডা. মরিস বুকাইলি

যেভাবে খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হলেন

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিঁতেরা প্রেসিডেন্ট পদে থাকেন ১৯৮১-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। তিনি তার পদে থাকাকালীন সময়ে আশির দশকের শেষের দিকে ফিরাউনের মমিকে আতিথেয়তার জন্য মিসরের কাছে অনুরোধ জানালেন। ফ্রান্স তাতে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করতে চাইল। মিসরের সরকার তাতে রাজি হল। কাজেই কায়রো থেকে ফিরাউনের যাত্রা হল প্যারিস। প্লেনের সিড়ি থেকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, তার মন্ত্রীবর্গ ও ফ্রান্সের সিনিয়র অফিসারগণ লাইন দিয়ে দাড়ালেন এবং মাথা নিচু করে ফিরাউনকে স্বাগত জানালেন।

যখন ফিরাউনকে জাঁকালো প্যারেডের মাধ্যমে রাজকীয়ভাবে বরণ করে, তার মমিকে ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রের একটা বিশেষ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সার্জনরা আছে এবং তারা ফিরাউনের মমিকে অটপ্সি (ময়নাতদন্ত) করে সেটা স্টাডি করবে ও এর গোপনীয়তা উদঘাটন করবে।

মমির উপর গবেষণার জন্য প্রধান সার্জন ছিলেন প্রফেসর মরিস বুকাইলি। থেরাপিস্ট যারা ছিলেন তারা মমিটাকে পুনর্গঠন (ক্ষত অংশগুলো ঠিক করা) করতে চাচ্ছিল, আর ডা. মরিস বুকাইলি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন যে কিভাবে এই ফিরাউন মারা গেল। পরিশেষে, রাতের শেষের দিকে ফাইনাল রেজাল্ট আসলো।

তার শরীরে লবণ অবশিষ্ট ছিল: এইটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে সে (ফিরাউন) ডুবে মার গিয়েছিল এবং তার শরীর ডুবার পরপরই সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র [লোহিত সাগর] থেকে তুলে আনা হয়েছিল। তারপর লাশটা সংরক্ষণ করার জন্য দ্রুত মমি করা হল। কিন্তু এখানে একটা ঘটনা প্রফেসর মরিসকে হতবুদ্ধ করে দিল, যে কিভাবে এই মমি অন্য মমিদের তুলনায় একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় থাকল, যদিওবা এটা সমুদ্র থেকে তোলা হয়েছে [কোন বস্তু

যদি আদ্র অবস্থায় থাকে ব্যাকটেরিয়া সেই বস্তুকে দ্রুত ধ্বংস করে দিতে পারে, কারণ আদ্র পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে]।

ডা. মরিস ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করল যাতে তিনি বললেন: এটা একটা নতুন আবিস্কার। সেই সময় তাকে একজন তার কানে ফিসফিসিয়ে বলল: মুসলিমদের এই ডুবে যাওয়া মমি সম্পর্কে ঝট করে আবার বলতে যেও না! কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে এর সমালোচনা করলেন এবং এটা আজব ভাবলেন যে, এরকম একটা বিশাল আবিস্কার যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সহায়তা করবে সেটা জানানো যাবে না।

কেউ একজন তাকে বলল যে কুরআনে বলা আছে যে ফিরাউনের ডুবা ও তার লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে। এই ঘটনা শুনে ডা. মরিস বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? এই মমি পাওয়া গিয়েছে মোটে ১৮৮১ সালে, আর কুরআন নাজিল হয়েছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। আরবেরা প্রাচীন মিসরীয়দের মমি করার পদ্ধতিতো জানতোই না, মাত্র কয়েক দশক আগে আমরা জানলাম। ডা. মরিস বুকাইলি সেই রাতে ফিরাউনের লাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকেয়ে বসে রইলেন, আর গভীরভাবে ভাবছিলেন যেটা তার কলিগ তার কানে ফিশফিশিয়ে বলে গেল যে মুসলিমদের কুরআনে ফিরাউনের লাশের সংরক্ষণের কথা।

বাইবেল ফিরাউন কর্তৃক মুসা আলাইহিস সালাম পিছু নেয়ার কথা বলা আছে কিন্তু ফিরাউনের লাশের কি হল সেটা সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করছিলেন যে, এটা কি সম্ভব যে এই মমি যার সেই (ফিরাউন) কি মুসা আলাইহিস সালাম-এর পিছু নিয়েছিল? এটা কি ধারণা করা যায় যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪০০ বছর আগেই এটা সম্পর্কে জানতেন?

ডা. মরিস সেই রাতে ঘুমাতে পারলেন না, তিনি তোরাহ (তাওরাত) আনালেন এবং সেটা পড়লেন। তোরাহতে বলা আছে, পানি আসলো এবং ফিরাউনের সৈন্য এবং তাদের যানবাহনগুলোকে ঢেকে দিল, যারা সমুদ্রে ঢুকল তাদের কেউই বাঁচতে পারল না। ডা. মরিস বুকাইলি হতবুদ্ধ হয়ে গেলেন যে বাইবেলে লাশের সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। তিনি তার লাগেজ বাধলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে যে তিনি মুসলিম দেশে যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত মুসলিম ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার নিবেন যাদের অটোপ্সি বিশেষজ্ঞ। তার সেখানে পৌঁছনোর পর ফিরাউনের লাশ ডুবার পর সংরক্ষণের যে আবিষ্কার তিনি যেটা পেয়েছেন সেটা নিয়ে বললেন। তাই একজন বিশেষজ্ঞ (মুসলিম) পবিত্র কুরআন খুললেন এবং আয়াতটা ডা. মরিসকে পড়ে শুনালেন যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তাআলা বলেন,

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

'অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ করে না।'[১]

তিনি এই আয়াতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং দর্শকদের (মুসলিম সার্জন) ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তিনি তার জোর গলায় চিৎকার দিয়ে বললেন: আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং আমি এই কুরআনে বিশ্বাসী। সুবহানাল্লাহ।

ডা. মরিস বুকাইলি ফ্রান্স ফিরে গেলেন এক ভিন্ন অবস্থায়। ফ্রান্সে ১০ বছর তিনি আর কোন ডাক্তারি প্রকটিস্ করেন নি বরং এই সময়ে (টানা ১০ বছর ধরে) তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে কোন বৈজ্ঞানিক দ্বিমত আছে কিনা সেটা খুজেছেন, তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ বুঝলেন যেটাতে বলা আছে,

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

'এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[২]

১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলি একটা বই লেখেন যেটা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে দেয়। যেটা বেস্ট সেলার হয়। বইটি প্রায় ৫০ টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বইটির নাম: 'বাইবেল, কুরআন এবং বিজ্ঞান' তিনি থিওরি অফ এভুলুশনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি বই লেখেন, যার নাম: What is the Origin of Man?

[১] আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, ১০:৯২
[২] আল-কুরআন, *সূরা ফুসসিলাত*, ৪১:৪২

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ-৩

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

পথের শুরু, যাত্রা শুরু

সুন্দর-শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়তে হলে প্রয়োজন একটি সফল-শিল্পময় জীবনের। সফল জীবনের জন্য প্রয়োজন সুন্দর কল্পনা। শিল্পচৌকস কল্পনা থেকেই জন্ম নেয় শিল্পময় পরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনা মানবজীবনের সবক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য ও অপরিহার্য। যেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যে।

বর্নানর্ড শ ইংরেজি ভাষার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি নিজেকে সেক্সপিয়রের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন, He was a much taller man than me. but I stand on his shoulders.

তিনি আমার চেয়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি ছিলেন। তবু আমি তাঁর কাঁধে উপর দাঁড়িয়ে আছি।

বর্নানর্ড শ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) মৃত্যুর প্রায় আড়াই শ বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেক্সপিয়র নিজের যুগে ইংরেজী ভাষাকে যে স্তরে উপনীত করেছিলেন বর্নার্ড শ নিজের প্রচেষ্টায় তাতে অল্পকিছু সংযোজন করতে পেরেছিলেন। এ সংযোজন দ্বারা তিনিও ইংরেজী ভাষাকে উন্নতির এক নতুন প্রান্তরে নিয়ে গেছেন। সেক্সপিয়রের পরে এবং বর্নার্ড শ'র পরে বহু কলমকার জন্ম নিয়েছেন যারা ভাষাটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। এসব চেষ্টার ধারাবাহিকতায় ভাষাটি এমন মানসম্পন্ন স্তরে পৌঁছেছে, যেখান থেকে বর্নার্ড শ নিজের কলমশক্তি দ্বারা আরেকটু এগিয়ে নেবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টার সুযোগ পেয়েছেন। বর্নার্ড শ'র জন্য যদি তার পূর্বসূরিরা যথেষ্ট শক্তিশালী একটি 'কাঁধ' তৈরি করে না যেতেন, তা হলে তার জন্য সম্ভবপর হত না যে, তিনি তার উপর ভরে উপরের দিকে ওঠবেন।

এ নিয়ম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। পূর্বসুরীরা একটা পথ তৈরি করে গেলেই সে পথের বাঁকমোড় চিনে উত্তরসুরিরা নতুন যাত্রা শুরু করতে পারে, কিংবা পারে যাত্রার ভিন্ন গতিপথ নির্ণয় করতে। পূর্বসুরীরা যদি নিজেদের অংশের কাজটা সম্পন্ন করে না যান, তা হলে পরবর্তীদেরকে যাত্রা শুরু করতে হয় পেছন থেকেই। কারণ, আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে, যেখানে পৌঁছার ইচ্ছা সেখান থেকে তো নয়। যে ঘরের নিচের দেয়াল এখনো তৈরি হয় নি, তার উপরের স্তরগুলো কিসের উপর দাঁড়াবে?

মানুষের জীবন এবং জীবনের সফলতাও দাঁড়িয়ে থাকে এরকম কোনো একটি মজবুত ভিত্তির ওপর। এখানে স্তরবিন্যাসের পরোয়া না করে অহেতুক লম্ফ-ঝম্প একেবারেই অকার্যকর। যেভাবে একটি বৃক্ষের শুরু বীজ থেকে হয়, তেমনিভাবে জীবনবিনির্মাণের শুরুটাও হয় একেবারে কাঁচা ও প্রথম ধাপ থেকে। শেষ ও শীর্ষ ধাপ থেকে কোনো কিছুর আরম্ভ সম্ভবপর নয়, জীবনেরও নয়।

বাণিজ্য শুরু হয় টাকা ইনভেস্ট করার মাধ্যমে, প্রথম ধাপ থেকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে নয়। ডাক্তারি করা যায় চিকিৎসাবিদ্যায় পাকা হওয়ার পর; বাজারে ডাক্তারির সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর মাধ্যমে নয়। একটি বাড়ির নির্মাণ ছাদ দিয়ে নয়, বরং খুটি ও ভিত্তির মাধ্যমেই হয়। শুধু দস্তরখান বিছিয়ে দিলে খানা পাওয়া যায় না, তার আগে ক্ষেতে ফসল ফলাবার কাজও সেরে নিতে হয়।

একইভাবে একটি জীবন ও একটি সমাজে কর্ম ও আন্দোলনের শুরু হয় প্রতিটি ব্যক্তির ভেতরে উদ্দেশ্যের সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে। লক্ষ্যানুরাগ ঢুকে যেতে হবে রক্তের কনায়-কণিকায়, অস্থির মজ্জায় মজ্জায়। তাদের ভেতরে সততার বীজ বপন করতে হবে। মানুষের প্রবৃত্তি সততার পথিককে নানা ছলছুতায় ঠেকিয়ে রাখতে চায়, পথের মসৃন পীঠ থেকে মুছে ফেলতে চায় শ্রম ও ঘামের ছাপ। ঠিক এ সময় একজন মানুষকে ভাঙ্গনমুখী হয়েও গঠনপিপাসু হতে হয়। ধৈয-ঔদার্য, ঐক্য ও সখ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে প্রথমে এসব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি না করে কোনো জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানে

ব্যর্থতার হাতছানিতে সাদরে সাড়া দেওয়া। এ ধরনের জাতিগঠনের মানেই হলো গ্রান্ডভিম ছাড়াই ছাদ নির্মাণ করা। এ ছাদ নিশ্চয় নির্মাণকারীর মাথায় পড়বে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগঠনের আগে জাতিগঠনের স্বপ্নও স্বেচ্ছায় ব্যর্থতা-আলিঙ্গনের নামান্তর।

পৃথিবীর বহুকিছুই বদলে গেছে, কিন্তু আমরা নিজেদের বদলাতে পারি নি। অনেকে জেগেছে, আমরা জাগতে পারি নি। যেন জাগার বাসনাই নেই আমাদের। চতুর্দিকে বাঁশরী বাজছে, কিন্তু আমরা নিঃশেষ নিদ্রায় ডুবে আছি। পূর্বসুরীরা চলে গিয়েছেন। তারা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন পদ ও পথ। কিন্তু সে পদ অলংকৃত করতে এবং সে পথ মাড়ি দিতে আমাদের যেন ইচ্ছেই নেই। কিংবা নেই এক চিলতে যোগ্যতাও। এখন, ঠিক এ মুহূর্তে আমাদের চতুর্পার্শ্বের প্রকৃতি থেকে যেন ধ্বনিত হচ্ছে :

আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?/সকলি উঠেছে; সকলি জেগেছে;
জাগিতে কি তব বাসনা নাই?/ আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?
দিকে দিকে শুন গভীর স্বনলে/হরষে বাঁশরী বাজিছে সঘনে
সকলি উঠেছে এ শুভ লগনে/কেহই যে আর ঘুমিয়ে নাই
আর কবে তুমি উঠিবে ভাই?
যাহারা জগতে ছিল চির দীন/নিতান্ত নবীন অথবা প্রাচীন/আর কেহ দেখ নহে আর হীন
নব যুগ ভবে এসেছে ভাই/জাগিতে কি তব বাসনা নাই?

(কবি মোজাম্মেল হক [১৮৬০-১৯৩৩])

চলার আগে চলতে শেখা

মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, হৃদরোগে বেছইন একজন রোগীকে এখান থেকে কয়টি ট্যাবলেট তুমি দিবে। চারটি : ছাত্র উত্তরে বলল। পাঁচ মিনিট পর ছাত্র শিক্ষককে বললেন, স্যার, দয়া করে আমার উত্তরটা একটু পাল্টাতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যি : শিক্ষক বললেন। কিন্তু শিক্ষক এ কথা বলার সাথে সাথে ঘড়ির দিকে দেখে বলে ওঠলেন, তবে দুঃখের বিষয়, তোমার রোগী তো ৪০ সেকেন্ড আগে মারা গিয়েছে।

হৃদরোগে বেছইন ব্যক্তির অবস্থা চরম সংকটাপন্ন। তাকে মুহূতে-মুহূর্তে অষুধের খাদ্য দিতে হবে। মুহূর্তের ভেতরই যদি সে চিকিৎসা না পায়, তা হলে সামনের একটি মুহূর্তের ভেতরই ত্যাগ করতে পারে মায়াবী পৃথিবী। তখন তাকে ডাক্তারের কাছে নয়, বরং সপর্দ করতে হবে কবরের কাছে।

মানুষের জীবনের অবস্থাও, বলতে গেলে, এরকমই। এমন কোনো বিষয় বা পরিস্থিতি এসে পড়ে, যার জন্য উদ্যোগ নিতে হয় মুহূর্ত বিলম্ব ছাড়াই। এমন অবস্থায় মানুষ যদি মুহূর্তের ভেতর সঠিক ও বাস্তোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে, তা হলে সামনের মুহূর্তটি ব্যর্থতার দিকে পা বাড়াবে, সফলতার দিকে নয়। আনন্দের দ্বার নয়, অশান্তির অধ্যায়ই সংযোজিত হবে সামনের মুহূর্তগুলিতে।

মানুষের জীবনকে উপমায়িত করা যায় রেলের সাথে। আমাদের দেশের কথা বাদ দিয়ে বললে, রেল সবসময় নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে পৌঁছয়। কয়েক মিনিট থেমে মুহূর্তের ভেতর আবার সামনের দিকে যাত্রা শুরু করে। ফলে ঠিক সময়ের রেল ধরতে হলে পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে প্লাটফরমে অপেক্ষার তিক্ততা ভোগতে হয়। অন্যথায় রেল তো আসবে, তবে তাকে ছাড়াই নিজের গন্তব্যের দিকে গতি বাড়াবে। তেমনিভাবে মানুষের দ্বারে সম্ভাবনা উঁকি দেয় ঠিকই। কিন্তু সে সম্ভাবনা কারো জন্য বইয়ে আনে সফলতার সাগর, আবার কারো জন্য বিছিয়ে দেয় বঞ্চনার পাথর।

প্রতিযোগিতার ময়দানের নামার আগেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। প্রস্তুতি ছাড়া ময়দানে অবতীর্ণ হলে ব্যর্থতাই আপনার ভাগ্যলিপি হবে – তা ধরে রাখুন। সব কাজেরই একটি বিরাম আছে, বিশ্রাম আছে, কিংবা ছিদ্র ও ছেদ আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যার্জনের প্রস্তুতিপর্বে এগুলির একটিও থাকা বাঞ্চনীয় নয়। প্রস্তুতির দু'টি দিক রয়েছে : নিয়তান্ত্রিক প্রস্তুতি এবং যুগোপযোগী প্রস্তুতি। আপনার প্রস্তুতি যদি নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংহত না হয়, তা হলে আপনি শুধু একজন বক্তার ভূমিকাই পালন করতে পারবেন। বাস্তব কৃতিত্বের সাক্ষর রাখতে পারবেন না। অন্যদিকে প্রস্তুতি যদি যুগের সঠিক চাহিদপূরণে অক্ষম হয়, তা হলে আপনার জায়গা হবে ইতিহাসের জাদুঘরে। প্রস্তুতির পূর্ণতা এড়িয়ে আপনি আর যাই করুন না কেন, সময়ের জীবন্ত মানচিত্রে জায়গা নিতে পারবেন না।

চাঁদের পিঠে চিহ্ন পায়ের

আমেরিকান নভোচারী আর্মস্ট্রং-কে (Neil Armstrong) একটু স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি সর্বপ্রথম চাঁদের দেশে পা রাখেন ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে। তিনি যখন নভোযান নিয়ে চাঁদের দেশে নামলেন, তখন আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে তার বার্তা পৌঁছুল: 'এটি একজন মানুষের জন্য তো ছোট কাজ, তবে মানব জাতির জন্য একটি বৈপ্লবিক উৎকর্ষ।'

আর্মস্ট্রং এবং তার দু'জন সাথী আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নভোচারীদের মধ্যে গণ্য। তাদের মাঝে ওইসব বৈশিষ্ট্য-গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, যেগুলো এরকম একটি কঠিনতম ঐতিহাসি অভিযানের জন্য দরকার ছিল। মেধা, কৌশল, শূন্যে বিচরণের অসাধারণ দক্ষতা, উপাত্ত সংগ্রহের ধৈর্যভারি যোগ্যতা এবং বরফের চেয়েও বহুগুণবেশি ঠাণ্ডা সহ্য করার চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি। তাছাড়াও সর্বক্ষণ কঠিন প্রশিক্ষণের কষ্ট তাদেরকে পান করতে হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ পানিতে থাকার অভ্যেস গড়তে হয়েছে। পরীক্ষা করতে হয়েছে আকস্মিক পরিস্থিতিতে

পেরে ওঠার সমূহ কৌশল। তারা রকেটের বিচরণ, নভোচারণ এবং নভোবিজ্ঞানের কোর্স সম্পন্ন করেছেন। চাঁদের প্রকৃতি ও নভোকপিম্পউটার বিষয়েও গবেষণা করেছেন। আসলে কাজের মতো কাজ করতে চাইলে এসব পাথুরে পথ পাড়ি দিতে হয়। সেখানে আকাশতুঙ্গ সাহসের সঙ্গে মিশে যেতে হয়ে স্বপ্নশ্রম, কষ্ট ও নিষ্ঠা।

তাদের তৈরি ৩১০০ টন ওজনের রকেট ছিল বিশাল দেবতার মতো। ৩৬ তলা ভবনের মতো উঁচু ছিল সেটি। তার ভেতর আট মিলিয়ন যন্ত্রপাতি ছিল। ইঞ্জিন ছিল ৯১ টি। সবকিছুর উপরে ছিল ছোট্ট মেশিন (ঈড়ষঁসনরধ) যার ভেতর বসে নভোচারীরা অভিযান পরিচালনা করছিলেন। নভোযানটি উপরে ওঠে আড়াই ঘণ্টা জমিনে চক্কর দিল। তার পর এর গতি মিনিটে ৪০৩ মাইল বেড়ে গেল। ৩০০০ মাইল উপরে ওঠে কলোম্বিয়া আলাদা হয়ে গেল। এ মেশিনের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সব অংশ যন্ত্রপাতিতে ভর্তি ছিল। নভোচারীদের বসার জন্য এটুকু জায়গা ছিল যেটুকু জায়গা থাকে একটি টেক্সিতে। শেষ পর্যন্ত নভোচারীরা চাঁদে নামলেন। সেখান থেকে ৪৬ পাউন্ড মাটি নিলেন। চাঁদে পিঠে তার পাঁচ লাক পাউন্ড পরিমাণ যন্ত্রপাতি রেখে আসলেন। অন্যান্য জিনিসের মতো তারা নিজেদের পায়ের চিহ্নও রেখে আসলেন চাঁদের পৃষ্ঠে, যা আনুমানিক অর্ধমিলিয়ন বছর সেখানে অক্ষত থাকবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

চিন্তা করে দেখুন, এতো পরিকল্পনা, এতো প্রস্তুতি, এতো সাধনার পরেই একটি ছোট পা চাঁদের দেশে রাখা সম্ভবপর হলো, যা মানব-ইতিহাসে অসাধ্য সাধনের সূচনা করেছে এবং সেই থেকে নভোচারণের ধারাবাহিকতা চলেই চলছে।

গাছের আশায় একশ' বছর

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ ক্যানেডী নিজের সম্পর্কে একটি কাহীনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একসময় নিজের বাগানের কর্মচারীকে একটি গাছের চারা লাগানোর কথা বললাম। সে দ্বিমত পোষণ করে বলল, এ গাছ খুব ধীরেই বাড়ে। পরিপূর্ণ গাছ হতে তার এক'শ বছর লাগে। এ কথা শুনামাত্র আমি বললাম, তা হলে তো বিলম্ব করে সময় নষ্ট না করা চাই। তুমি আজকে দুপুরেই গাছটির চারা লাগিয়ে দাও।

জীবনগঠন এবং জাতিগঠন, জীবন ও জাতির উন্নতিসাধন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে অসংখ্য উপকরণ হাতে আসার পরেই একটি জাতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে জায়গা করে নিতে পারে। কিন্তু এরকম পরিকল্পনা পেশ করা হলে মানুষ হঠাৎ-ই বলে ফেলে : এতো দীর্ঘ পরিকল্পনা! এটা বাস্তবায়ন করতে তো সময় লেগে যাবে শত বছর। তাদের কাছে আরজ হলো, তা হলে আর একটি মুহূর্তের জন্য দেরি কেন? এক্ষুণি বপন করতে হবে আমাদের 'চারাগাছ'। এখানে রাবণের কল্পনা দিয়ে কিছু হবে না। একটি কাজ সম্পন্ন হতে যদি সময় লাগে, তা হলে তাতে বিলম্ব মোটেও সমীচীন নয়। তা শুরু করতে হবে এখনই। ইশ্বরচন্দ্রের 'ওয়াজ' শুনুন:

তখনি করিবে তাহা যখন যা
হয়/বিলম্ব-বিধান তার কোনমতে নয়।
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন/কখন
হবে না আর সুফল সাধন।
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত/কল্পনা
হয় না যেন রাবণের মত।

একটি 'চারা' শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত হতে সত্যি 'শত বছর' লাগে। সুতরাং যার শক্তিশালী বৃক্ষ দরকার তাকে শত বছর বাগানচর্চা করতে হবে। তা না করে যদি কেউ পথে বের হয়ে বড় বড় বুলি আউড়ায় এবং 'জাতির বাগান জিন্দাবাদ' শ্লোগান ধরে, তাতে না গাছ গজাবে, না সৃষ্টি হবে একজন কর্মঠ বাগানী। বরং এর পরিণতি তো এটাই হবে যে, গাছ গজাবার যে সময় ও শক্তিটুকু স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া হয়েছিল সেটাও সে হাতছাড়া করে বসছে। আপনার কাছে বাড়ি নেই। এখন আপনি যদি চৌমুহনীতে দাঁড়িয়ে 'বাড়ি, বাড়ি' করে চিৎকার করেন, তাতে আপনার কোনও লাভ হবে না। আপনি একটি বাড়ির মালিক হতে পারবেন না। তেমনিভাবে জাতির নাম নিয়ে কিছু ব্যক্তি শুধু বুলির বোমা ফাটালে জাতির ভাগ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না। কাব্যিক কল্পনার জগতেই শুধু বাক্যবাণে বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব; বাস্তবতার জগতে নয়। জ্বালাময়ী বক্তৃতা ঝরিয়ে একজন বক্তা সমাবেশকে আকাশের আসনে পৌঁছে দিতে পারেন। বুলি কপচানোর দারুন পটুতা দিয়েও কিছু হবে না। হবে যা, তা একমাত্র চেষ্টা, সাধনা ও শিল্পোচিত পরিকল্পনার মাধ্যমে। অন্যথায় দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে তাদের নাক-মুখ থেতলে হয়ে যেতে পারে, সফলতা তাদের ধরা দিবে না।

তবে নিছক চেষ্টা এবং সঠিক চেষ্টার মাঝে পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। এ পার্থক্য বুঝে নিতে পারলে সফলতার পথের অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক তৎপরতাকেই তৎপরতা মনে হয়। প্রত্যেক কর্মকে মনে হয় কর্ম। আপনি নিজের গাড়ি গন্তব্যের দিকে চালান বা গন্তব্যের বিলকুল উল্টো দিকে চালান; গাড়ি তো চলবেই। দর্শকদের দৃষ্টিতেও গাড়ি চলছে। উভয় অবস্থায় গাড়ির চলনগতিতে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। কিন্তু বাস্তবতার আয়নায় উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। এক চালনা আপনাকে মিনিটে-মিনিটে গন্তব্যের কাছাকাছি করছে, আরেক চালনা গন্তব্য থেকে নিয়ে যাচ্ছে যোজন-যোজন দূরে।

ব্যক্তিগত জীবনে হোক বা সামাজিক জীবনে সবসময় পরিস্থিতি ও

উপকরণের পূর্ণ খবর রেখেই যাত্রার দিক নির্ণয় করতে হয়। আর এ যাত্রাই আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, হোক বিলম্বে কিংবা অবিলম্বে। কিন্তু সঠিক দিক ও দিশা না নিয়ে দৌড় শুরু করলে সে দৌড় সর্বনাশও ডেকে আনতে পারে।

অধিকাংশ মানুষ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই একটা কাজ শুরু করে অথবা সাময়িক আবেগের বশিভূত হয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরে যখন তার সুফল পায় না, তখন দোষটা চাপায় অন্যের ঘাড়ে, অপরাধ ঠেলে দেয় অন্যের ঘরে। অমুকের পক্ষপাতিত্ব এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে আজ আমার এ ব্যর্থতা– ইত্যাদি কথা আউড়াতে থাকে। অথচ সে গভীর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, মূলত ভুলটা নিজের, অপরিণামদর্শিতা নিজ গরজের। সঠিক পথ না চিনে যাত্রা শুরু করার কারণেই তার এ বিষম বিপদ। তবু মানুষ নিজের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তার শরীরে কাঁটা বিধে অন্যের সফলতায়। অথচ অন্যজন সফল হওয়ার নৈপথ্যে সে নিজেই। সঠিক পথে অগ্রসর না হওয়ার কারণেই তো অন্যজন এগিয়ে যাওয়ার সুযোগটা পেল। পথের সঠিক দিশা নিয়ে যাত্রা শুরু করলে তার পথ কেউ আটকে দিতে পারত না। পারত না কেউ তাকে বেপথু করতে।

‘সবার আমি ছাত্র’

জীবনের এ পাঠ, সফলভাবে বেঁচে থাকার এ প্রজ্ঞাপাঠ শিখতে হয় নিজ থেকে, নিজের চতুর্পাশ থেকে। এ পাঠ ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির খাতায়, পৃথিবীর পাঠশালায়। আকাশ থেকে শিক্ষা নিতে পারি উদারতার, পাহাড় থেকে মহত্তের। সূর্য থেকে শিক্ষা নিতে পারি তেজ ও গরিমার, চাঁদ থেকে নিতে পারি কঠিন মুহূর্তেও জোছনামুখে হাসতে জানার। সাগরের কাছে শিক্ষা পাই বে-গরজ নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার, নদীর কাছ থেকে পাই লক্ষ্যপানে আপনবেগে চলার। সহিষ্ণুতা পাই মাটির কাছে, সরসতা পাই ঝরনার গানে। দিনের দীপ্তিতে রাতের সুপ্তিতে কোথায় নেই মহৎ একটি শিক্ষ, যা আপনাকে বদলে দিতে পারে আপনারই অজান্তে। তাই জীবন-পুস্তকের নতুন পাতা শুরু করতেই আমি গেয়েই ওঠি :

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর, সবার
আমি ছাত্র/নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়/পাঠ্য যে-
সব পাতায় পাতায়/শিখছি সে-সব
কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

(সুনির্মল বসু [১৯০২-১৯৫৭])

মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের

চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা

ডাক ও কোরিয়ার যোগে ঔষধ পাঠানো হয়

এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও মহিলাদের গোপন রোগের নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয়। উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত।

বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের ফাইল মাত্র ৪০০/= টাকা। প্রথম দিন হতেই উপকার পাবেন ইনশাআল্লাহ। বহু বছরের পরীক্ষিত নিরাপদ ও পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ঔষধ।

চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী

- এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাঁও,
- সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা,
- সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন,
- তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা,
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত মুজিযা

মূলঃ শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

অনুবাদঃ মু. সগির আহমদ চৌধুরী

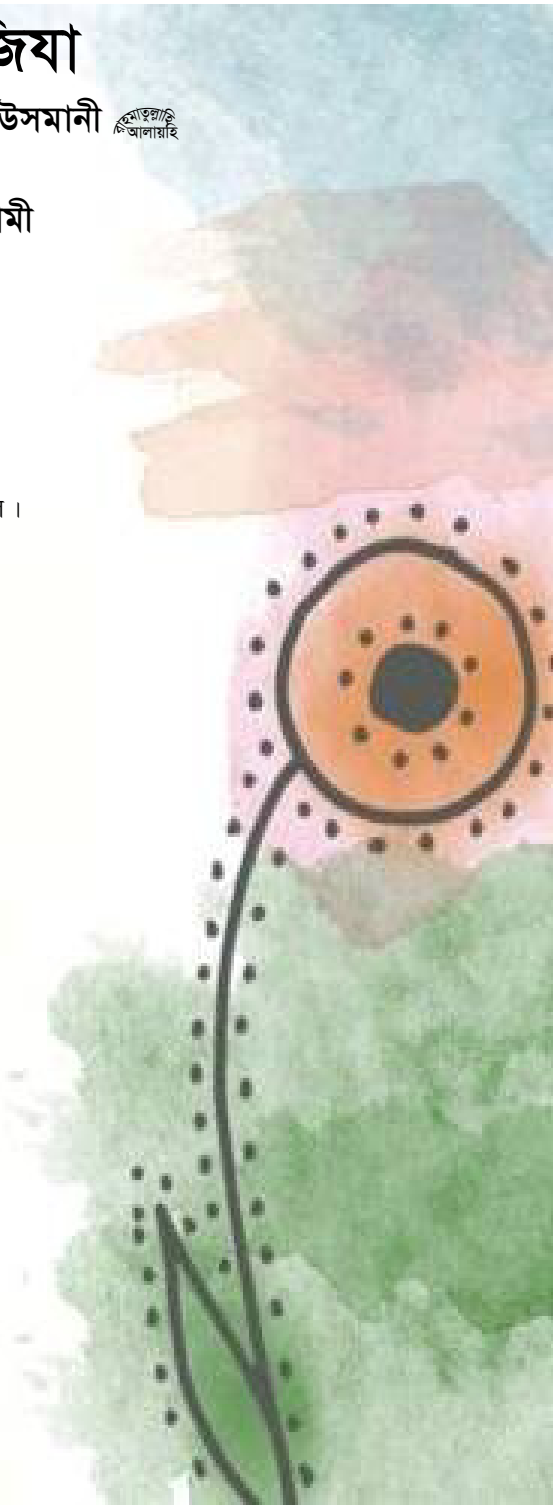

কাব্যানুবাদঃ কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী

॥১৬॥

হযরত বেলাল দিলেন আযান তীব্র শীতের ফজর বেলা
একজনও নামাজী হাযির হয়নি মসজিদে শীতের তীব্রতায়,
শীত কমাবার দুআ করিলেন আল্লাহর নবীজি তখন
সেদিন থেকেই শীতের মৌসুমে ফজর বেলায় পড়িল গরম,

আশি বছর বয়সেও পাকা ধরেনি মাথার চুল
হাত বুলালেন হযরত যারকীর মাথায় তাই আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহর রাসূল হাত বুলালেন বুশাইরের মাথায়
সে অংশের চুল পাকেনি কখনো মৃত্যু অবধি যেথায়,
রাসূলুল্লাহর সুখেল লালা লাগিয়ে বুশাইরের মুখ
তোতলামি রোগ মুক্ত হলো, থাকলেন বুশাইরের সুখ।

এক ইহুদী নবীর জন্য দুধ আনিলেন উপহার
নবীর দুআয় জীর্ণ মুখ সুন্দর হইলো তার।

হযরত সাআদের সকল দুআ কবুল হতো সর্বদায়
তাঁহার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ নবী করেছিলেন তাই।

রাসূলুল্লাহর করলেন দুআ হযরত আবদুর রহমানের লাগি
বাণিজ্যে হয়েছিল উন্নতির ভাগি।

চাচা আব্বাসের কাছে একদিন রাসূল পাঠালেন খবর
তিনি আসার আগ অবধি কেউ না ছাড়ে ঘর,
চাচার বাড়ি হাজির হয়ে নবী সবাইকে বসালেন এক জায়গায়
চাদর ঢেকে সবাইকে হাত তুলিলেন রাসূল দুআয়,
জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ আমার চাচার মুক্তি দিন
নবীর সাথে ঘরের দেয়াল বললো তখন, আমীন আমীন।

পৃথিবীর দেশে দেশে রাষ্ট্র প্রধানের কাছে পাঠালেন রাসূল
আল্লাহর বাণী যথাপ্রচারে সাহাবীগণ হন মশগুল,
প্রত্যেক জাতির ভাষা তারা নিখুঁতভাবে আয়ত্ব করে
ঐশী বাণী পৌঁছে দিলেন পৃথিবীর ঘরে ঘরে।

ক্ষয় হয়ে যায় উহুদের যুদ্ধে হযরত জাহাশের তরবারি
এনে দিলেন জাহাশের হাতে তবে রাসূল খেজুরের লাকড়ি,
হয়ে যায় তরবারি সেই লাকড়ি উহুদ যুদ্ধের দিনে
রাসূলের মুজিযা বুঝিতে তবু পারেনিকো বেঈমানে।

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব–১০ ও ১১

শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী

খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

সৌরজগতের গ্রহ গুলোর মধ্যে বুধের পরে সূর্যের সব চেয়ে কাছে রয়েছে শুক্রগ্রহ। শুক্র গ্রহের ইংরেজি নাম ভেনাস Venus। এই গ্রহটিকে কখনো সন্ধ্যা আবার কখনো ভোর রাতে উত্তর আকাশে দেখা যায়। ভোর রাতে এই তারাকে শুকতারা আর সন্ধায় সন্ধ্যাতারা নামে ডাকা হয়। এই শুক্রগ্রহকে মাঝেমাঝে দিনের বেলায়ও দেখা যায়। আর এটি সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে দুই নাম্বারে হলেও আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ এটি। মাঝে মাঝে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আসে; তখন শুক্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় চাঁদ থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বের প্রায় ১০০ গুণ। ১৮৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বরে শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে পৌঁছেছিল তখন এর দূরত্ব ছিল ৩৯,৫৪১,৮২৭ কিলোমিটার। সূর্যের প্রায় সব কটি গ্রহই সূর্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে। কিন্তু এই শুক্রগ্রহটি ঘুরছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আমাদের পৃথিবীতে সূর্য পূর্ব থেকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি, কিন্তু শুক্রগ্রহে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়ে পূর্বে অস্ত যায়। শুক্রের আহ্নিক গতি হচ্ছে পৃথিবীর হিসাবে ১১৬.৭৫ দিনের সমান। আর তার নিজের কক্ষ পথে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ২২৪.৭০ দিন। তার মানে শুক্রের মাত্র ১.৯২ দিনেই শুক্রের এক বছরহয়ে যায় অর্থাৎ প্রায় দুই দিনে একবছর।

সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব ১০৮,২০৮,৯৩০ কি. মি.।

ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি এটি একটি গ্রহ। ইংরেজিতে এর নাম earth আর্থ। আমরা মানুষেরা ছাড়াও আরো কোটি কোটি প্রাণী বাস করে এই গ্রহে। সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে এর অবস্থান ৩য়। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। আর সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা।

ছোট্টবন্ধুরা! আমরা জানি ৩৬৫ দিনে একবছর হয়। তাহলে এই বাড়তি ৬ ঘণ্টা যায় কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে আমরা জানি ফেব্রুয়ারি মাস হয় ২৮ দিনে। কিন্তু প্রতিচার বছর পর পর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে হয়। তার মানে দাঁড়াল প্রতি বছর ৬ ঘণ্টা করে বাড়তে বাড়তে চার বছর পরে ৪×৬=২৪ চব্বিশ ঘণ্টা বেড়ে যায়। এই বড়তি দিনটিকে চার বছর পরে ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। তখন ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৯ দিনে ধরা হয়। আর এই বছরকে লীপ ইয়ার বলা হয়।

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে, এই পৃথিবী ফুটবলের মতো গোল হলেও ফুটবলের মতো ভেতরে ফাকা নয়। তাহলে এই পৃথিবীর ভিতরে কি আছে একটু দেখা যাক। আমরা দেখি পৃথিবীতে মাটি, পাথর, বালি, পানি ইত্যাদি। হ্যাঁ এসব জিনিস পৃথিবীর উপরের স্তরে রয়েছে। এই স্তর টিকে বলা হয় ভূতক। এটি ৩৫ কিলোমিটার মোটা। এর নিচে রয়েছে শক্ত পাথর। এই স্তরটি ২০০ কিলোমিটার পুরো। এটিকে বলা হয় অশ্মমণ্ডল। তারপরে রয়েছে অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, অ্যালমুনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের অক্সাইডসমূহ। এই স্তরের নাম গুরুমণ্ডল। এর পুরুত্ব প্রায় ২৯০০-২৮৫০ কিলোমিটার। তারপরে রয়েছে লৌহ-নিকেল,

সিলিকাসমৃদ্ধ উপাদান। এর পুরুত্ব স্থান বিশেষে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তারপরে রয়েছে উর্ধকেন্দ্রমণ্ডল নামে একটি স্তর। এই স্তরে রয়েছে লোহা। এখানে তাপমাত্রা খুব বেশি। প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই এখানে লোহা গুলো তরল অবস্থায় রয়েছে। এর ব্যাস ১.২২০ কিলোমিটার (৭৬০) মাইল। একেবারে মধ্যখানে রয়েছে কঠিন লোহা। মাঝখানে আরও কিছু ছোট বড় স্তর রয়েছে। সব মিলেয়ে পৃথিবীর উপরিতল থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৬৩০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি।

এখানে আরও কয়েকটি জিনিস জেনে রাখা ভালো।

- পৃথিবীর আয়তন প্রায় ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গকিলোমিটার।
- পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,২৩৪ কি. মি. বা ২৫,০০০ মাইল।
- পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৭৬৫ কি. মি.।
- পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪৩৬ কি. মি.।
- পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন ১৪,৮৯,৫০,৩২০ বর্গ কি. মি.। (মোট আয়তনের ২৯ ভাগ)।
- পৃথিবীর জলভাগের আয়তন ৩৬,১১,৪৮,২০০ বর্গ কি. মি.। (মোট আয়তনের ৭১ ভাগ)।
- পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ১৪,৯৫,০০,০০০ কি. মি.।
- পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কি. মি.।
- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
- নিজ অক্ষের ওপর একবার আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট।
- অনুমান করা হয় পৃথিবীর বয়স ৫৫৭ কোটি বছর।

পৃথিবীর বয়স ৫৫৭ কোটি বছর হলেও পৃথিবীতে মানুষের আগমনের বয়স কিন্তু তত বেশি নয়। কারো কারো মতে পৃথিবীতে মানুষের আগমন এখন থেকে কত বছর আগে হয়েছে তা সঠিক ভাবে সম্ভব হয়নি। কেউ বলেন, দুই লাখ বছর আগে মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে, আবার কেউ কেউ বলেন মাত্র ১০ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আগমন। অন্যান্য প্রায় সব প্রাণীই মানুষের আগে এসেছে পৃথিবীতে।

পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় এখানে কোনো প্রাণীর টিকে থাকার মতো পরিবেশ ছিল না। তখন পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। ধারণা করা হয় সূর্যের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এই পৃথিবীর জন্ম হয়। আবার কেউ কেউ বলেন দুটি গ্রহের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। ধীরে ধীরে এট ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং প্রাণীদের বসবাসের উপযোক্ত হতে থাকে।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

'নিপূণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।'[১]

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-মুমিনুন*, ২৩:১৪

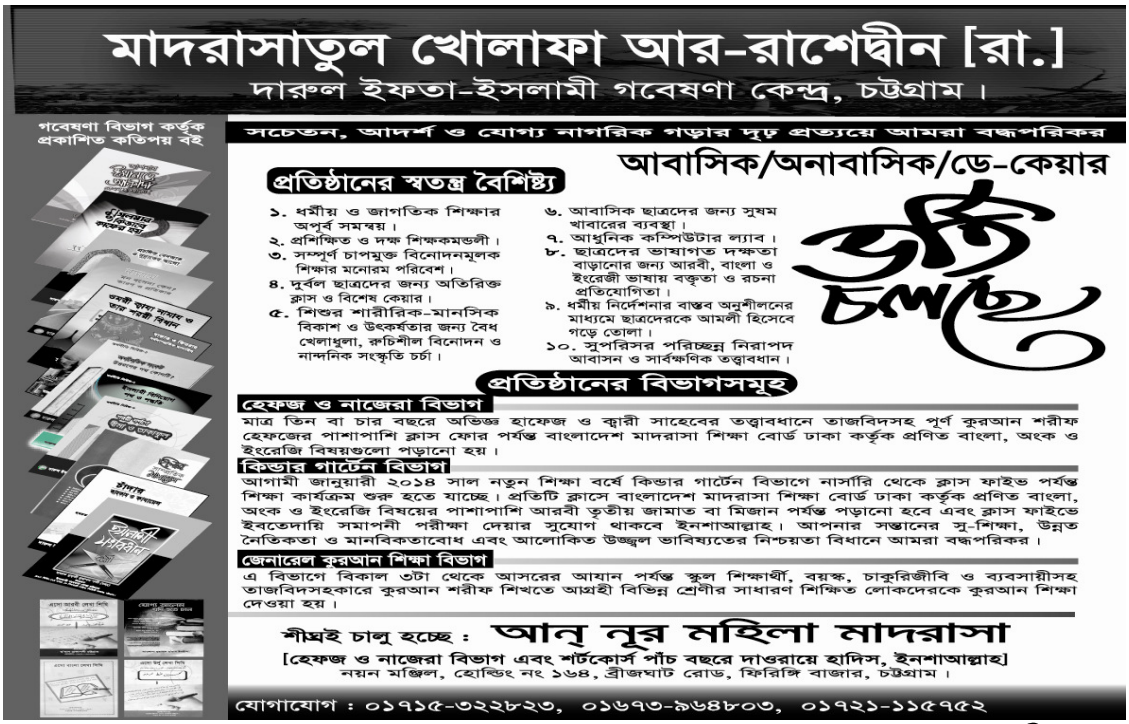

মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে
মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার

কুল্লু নাফসীন যা...
মরণ থেকে কেউ পালাতে পারবে না,
আল্লাহর ফরমান ।
বারযাখ দিয়ে পরকাল শুরু
হাদীসে প্রমাণ খাঁটি,
মৃত্যুর পরে কবরের ভিতরে,
রেহাই দিবে না মাটি ।

কবরে আসবে দু'জন ফেরেস্তা,
মানকির আর নাকির,
জিজ্ঞাসিবে না কবরবাসীকে,
আমির কি, ফকির ।
কে তোমার রব, কী ছিল দীন,
ওয়ামান নবীউকা
গুনাহকার সকলে জানি না জানাবে
পাবে না মুক্তির দেখা ।

সঠিক জাওয়াবে শান্তির ধারা
ঈমান আমলের জন্য
পূণ্যের কারণে পুষ্পকানন
জান্নাত বরে গণ্য ।
চুলের চেয়ে চিকন, হিরার চেয়ে ধার
বিচার-ফয়সালার দিন
ঈমান-আমল ছাড়া সকলে দীনহীন ।

তাই আমি কবিতায় বলি বার বার,
দুনিয়ার লোভে সময় নাহি বার পার ।
পাপী-তাপী সকলে হাশরের মাঠে
আল্লাহর ভয়ে থরো অগ্নিঘাটে ।
সেদিন কারো চলবে না আবদার
সকল ক্ষমতা বিশ্ববিধাতার ।

জীবন কোন কাজে অহি বাহিত করেছো?
যেবিনে জোয়ানির তেলায় চড়েছো?
কোন পক্ষে সম্পদ কচ্ছো আয়?
তা তুমি কোন পথে করছো ব্যয়?
এ চার প্রশ্নের বান্দা হিসাব দাও
তোমার ন্যায্য প্রাপ্য বুঝ নাও ।
ন্যায় বিচারের এক মহাউৎসব
যেদিন সকলে করবে অনুভব ।

এমন যদি হয়
মাহমুদুল হাসান নিজামী

এমন যদি হয়
তবে কেমন হয়
একের শ্রীতে অন্য জনের
হিংসা নাহি হয়
এমন যদি হয়
তবে কেমন হয়
চাকরী করে বেতন নেব
কাজে ফাঁকি নয়
এমন যদি হয়
তবে কেমন হয়
পরের ভালো সবে চায়
কেউ কারো নয় ভয়
এমন যদি হয়
তবে ভালো নয়
নিজে খাবে পেট ভরে
অন্যে উপোস রয়
এমন যদি হয়
বেশি ভালো হয়
সুখে দুখে পরস্পরে
সমান তালে রয় ।

ইচ্ছে করে
আবদুল কাইয়ুম জাকি

ইচ্ছে করে পাখির মতো
ডানা দুটি মেলি
উড়ে উড়ে দূরে গিয়ে
মনের মতো খেলি ।

আনন্দেতে ইচ্ছে মতো
নাচবো তাধিন ধিন
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে
কাটবে সারাদিন ।

দুচোখ ভরে দেখবো আমার
সোনার বাংলাদেশ
যার রূপেতে পাগলপারা
রূপের নাই যে শেষ ।

হরতাল
মিজানুর রহমান

বিরোধী দল ডাকে হরতাল
সরকারীদের মাথা বেতাল,
জনগণে দুর্ভোগ
করে শুধু উপভোগ ।
হায়রে তুমি হরতাল
প্রাণ নিয়ে যাও অকাল,
হরতালে রাস্তা ফাকা
চলেনা গাড়ির চাকা ।
সরকারী দল অস্ত্রে হাকা
বিরোধী দল রক্তে মাখা,
সোনার ছেলে কি যে খোকা
মানুষ কি এত বোকা,
আবার পল মন্ত্রীর কোটা
ঘুষের টাকায় পেটটি মোটা
খেয়ে চাটবে দেশটি গোটা ।
সবাই পিচ্ছি পোকা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দিচ্ছে ধোকা,
আম জনতা হচ্ছে গুম
কারো নেই চোখে ঘুম ।
যারা দেশের রক্ষক
তারা এখন ভক্ষক ।

স্বাধীন রাষ্ট্রে অধীন কেন?
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক

একাত্তরে স্বাধীন হল
আমার বাংলাদেশ,
এতদিনেও পায়নি মোরা
স্বাধীনতার লেশ ।
বর্তমানে নিরাপদ নয়
কোন মানুষের জান,
বাহির হলে গুম আর
ঘরে থাকলে খুন ।
স্বাধীন রাষ্ট্রে অধীন কেন?
এটাই সবার প্রশ্ন,
অনেক মানুষ মারছে এখন
না পেয়ে তার অন্ন ।
স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে
সবাই চেষ্টা করি,
মুক্তিযুদ্ধে জানদাতাদের
মানকে রক্ষা করি ।

বুদ্ধির জয়

একদেশে একরাজা ছিল। সে ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি আমাকে নতুন কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতে পারবে, তাকে আমি সে যে পাথরে কবিতা লিখে আনবে সে পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দান করা হবে। আগেকার যুগে কাগজ ছিল না, তাই পাথরে লিখত। ঘোষণা শোনার পর বড় বড় কবিরা নতুন নতুন কবিতা লিখে রাজার সামনে পড়ে শুনাই। কিন্তু কেউ পুরস্কার অর্জন করতে পারেনি। বরং সবাই হেরে পরাজয় হয়ে ফিরে আসতো। কারণ বাদশা ছিল সে একবার শুনে যে কোন কিছু মুখস্থ বলে দিতে পারতো। কবিরা যখন কবিতা শেষ করতো, রাজা বলে উঠতো, আমি এটা আগে থেকে জানি, সে একথা বলে পড়ে শুনাতো।শেষ হওয়ার পর বলতো, এটা আমার প্রধানমন্ত্রিও জানে। কারণ সে দু'বার শুনে মুখস্ত বলে দিতে পারে। এক বুদ্ধিমান কবি বলল আমি পুরস্কার আনব। একটা বড় পাথর নিয়ে সেখানে নতুন কবিতা লিখলো। রাজাকে গিয়ে বলল, আমি নতুন কবি আবৃত্তি করে শোনাব। রাজা বলল, ঠিক আছে, পারলে পুরস্কার নিয়ে যাবে। তখন কবি কবিতার এক লাইনের অর্ধেক পড়ে বলল, এটা নতুন না পুরাতন? রাজা বললেন, পুরাতন। কবি বলেন পড়ে শোনান। পড়ে শোনাল। কবি এবার বললেন, বাকি লাইন পড়ে শোনান। রাজা তখন হা করে বসে রইল। কবি পুরস্কার জিতে নিল।

মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দীন *[সদস্য # ১৬]*

একটি পত্র প্রভুর নামে

বাদশাহ হারুনুর রশীদ। তাঁর শাসনমলে এক বুযুর্গকে ঘিরে তাঁর মর্মস্পর্শী হৃদয় আলোড়ন ঘটনা এটা। তিনি ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক। তার দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল হঠাৎ করে তার করতল এক অঞ্চলে ডাকাতের উৎপাত মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে একদল সেনা সেখানে হানা দিয়ে দশজন কুখ্যাত ডাকাত ধৃত করে। তাদের বন্দি করে আনার পথে একজন হাত ফসকে পালিয়ে যায়। জবাবদিহির ভয়ে এক নিরীহ নিরাপরাধকে গ্রেফতার করে দশের কোটা পূর্ণ করেন। এদিকে উত্তরোত্তর আত্মীয়-স্বজন মুচলেকা দিয়ে স্বীয় স্বজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পরিশেষে নিরাপরাধ ব্যক্তিটি থেকে গেলেন। সেই কারাগারের তিমিরাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে কিছুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তার মুক্তির জন্য কেউই আসছে না। এটা দেখে জেলপ্রহরী তাকে বলল, তোমার কি প্রিয়জন বলতে কেউ নেই? বুযুর্গ বললেন, বাবারে, এ ভূবনে আপনজন বলতে কেউ নেই। যিনি আছেন তিনি আরশে। তারপর একটি পত্রে কী জানি লেখে তার হাতে লি ও চুপিসারে বললেন। সে পড়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। কারণ এটা তো মূলত কোন সাধারণ পত্র ছিল না। এটা ছিল তাঁর ব্যথাতুর হৃদয়ের ভাব-আবেগের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস এবং অসহায় আত্মার আলোক-উদ্ভাস। সে ভাবের তরঙ্গে আবেগের উচ্ছ্বাসে শব্দের সুরঝংকারে এবং ভাষার নৃত্যছন্দে শিহরিত হল। তারপর নির্দেশানুযায়ী সে উদগ্রীব হয়ে ছাদে নিয়ে পত্রটি ছেড়ে দিতেই ফরফর করে উড়ে এক পর্যায়ে মেঘমালার ভিড়ে হারিয়ে যায়। আর সে নির্বাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুই তার বোধগম্য হল না। সে রাত্রে বাদশাহ এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেন। দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে আকাশ পানে উঠিয়ে যাচ্ছে তাঁর তো ভয়ে যায়যায় অবস্থা। গগনমালার শীর্ষচূড়ায় নিয়ে তাকে বললেন, তোমার কারাগারে নিরাপরাধ এক আল্লাহর তায়ালার প্রিয় নিরপরাধ বান্দা হয়েছে তাকে মুক্ত করে দাও। নচেৎ পড়ে ফেলে দিচ্ছি পড়ে চিৎপাট হয়ে যাবে। এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে দৌড় দিয়ে কারাগারে গিয়ে তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। পরে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন ও বললেন, এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল কারণ যে আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়ে যায়। তাকে এভাবেই কৃতার্থ করেন।

মুহাম্মদ ইসমাঈর সিরাজী *[সদস্য # ৩০]*

আমরা কি জানি?

- পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চর্বি থাকে তা দিয়ে আস্ত একটি কাপড় কাঁচার সাবান এবং ৭৬ টি মোমবাতি তৈরি করা যায়।
- দেহে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তা দিয়ে কমপক্ষে ৮০০ দিয়াশলাই তৈরি হতে পারে।
- দেহে যে পরিমাণ কার্বন থাকে তা দিয়ে প্রায় ৯০০০ টি পেন্সিলের শিস তৈরি হবে।
- দেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকে তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের একটি বাল্ব অন্তত ৫টি মিনিট জ্বালিয়ে রাখা যায়।
- শরীরে গন্ধক থাকে ১০ তোলা, লবণ আছে প্রায় ৬ চামচ, রক্ত থাকে ৪ গ্যালন।
- মানুষের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হল ত্বক।
- একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহ থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬ লাখ ত্ব কোষ ঝরে পড়ে।
- পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা ২০৬ খানা।
- শরীরের ২০৬ খানা হাড়ের মধ্যে চারভাগের এক ভাগ হাড় রয়েছে পায়ে।

সংগ্রহে: হুমায়রা *[সদস্য # ১০]*

নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম

♣ নতুন সদস্যদের তালিকা ♣

৮৩. **হাফেজ মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ ওবাইদ**, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম # ১/১২, কাসরে জুনুবী, পটিয়া, চট্টগ্রাম–৪৩৭০

৮৪. **মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন**, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম # ৬, দারে জদীদ (১ম তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম–৪৩৭০

৮৫. **মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ**, জামিয়া মাদানিয়া নোয়াখালী, দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর

♣ ফোরামের নিয়মাবলি ♣

- স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে।
- নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
- সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
- লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা

বিভাগীয় সম্পাদক
মাসিক আত্-তাওহীদ
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা)
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০
ই-মেইল: *mti_shahin.bd@gmail.com*

সদস্য কুপন

নামঃ ... ...

প্রযত্নে/প্রতিষ্ঠানঃ ... ...

বাড়ি/রুম.... ... ...

গ্রাম/সড়কঃ ... ...

ডাকঘরঃ ... ... পোস্ট কোডঃ ... ... থানাঃ ... ... জেলাঃ ... ...

মোবাইলঃ ... ... সদস্য ক্রমিকঃ ... ... [অফিস কর্তৃক পূরণীয়]

নওল হাতের কলম

... ...
সাক্ষর

قلم گفتا کہ من شاہ جہانم
কলমের কথা:
আমি তো পুরো পৃথিবীর বাদশাহ

আবাসিক/ অনাবাসিক

আবু ছাহাত-মরিয়ম বেগম মহিলা মাদ্‌রাসা

নার্সারী-৩য় নূরাণী শাখায়, ৪র্থ হতে দাখিল ও আলিম (দাওরা হাদীস) পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্য — কম্পিউটার প্রশিক্ষণ —

- স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা
- শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ ☛ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা
- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান
- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
- সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ☛নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা
- উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা

বিশেষ কোর্স
[তা'হিলী বিভাগ]
প্রথম বছরে
৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০
বেতন : ১০০/১৫০/২০০
খোরাকী : ১২০০/১৪০০
বিদ্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০

যোগাযোগ: মাদ্‌রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন
পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২

আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০

প্রতিযোগিতা

কথায় কথায় উত্তর

১. কুরবানির ধারা সূচনা হয় কোন নবী থেকে– ☐ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ☐ হযরত আদম (আ.) ☐ হযরত ইবরাহীম (আ.)

২. 'যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়ে তার নামায অসম্পূর্ণ'-কার বাণী? ☐ মুহাম্মদ (সা.)-এর ☐ আল্লাহর বাণী ☐ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৩. ইমাম আদী ইবনে হাতিম (রহ.) কার পুত্র? ☐ হাতিম তায়ি রহ.-এর ☐ আবু জেলেহের ☐ হযরত হামযা (রাযি.)-এর

৪. ইমাম আবু হানিফা ছিলেন একজন ☐ সাহাবী ☐ তাবেয়ী ☐ তাবে-তাবেয়ী

৫. 'মাটি হতে ওহে নর, তোমার সৃজন/মাটির মতোই নত হও সর্বক্ষণ' কার চরণ? ☐ আল্লামা ইকবাল (রহ.) ☐ শেখ সাদী (রহ.) ☐ আল্লামা রুমি (রহ.)

৬. 'Charity in islam: Benefits & Exellences' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন ☐ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ☐ ড. মাওলানা আ ফ ম খালিদ হোসেন ☐ মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী

৭. সূর্য নিজের চারদিকে একবার ঘোরে কত দিনে? ☐ ২৬ দিন ☐ ২৭ দিন ☐ ২৮ দিন

শব্দের মারপ্যাচ

নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন:

১. নারি– ☐ ২. নারী– ☐

৩. ভারা– ☐ ৪. ভাড়া– ☐

আগস্ট'১৩ সংখ্যার সমাধান:

পর্যাপ্ত পরিমাণ সঠিক উত্তরপত্র না-আসায় প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হয়েছে।

উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি

কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১৩ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে।

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত বাক্সে লিখুন। প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে।

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার:

প্রথম পুরস্কার: ৳ ৯০-১০০
দ্বিতীয় পুরস্কার: ৳ ৬০-৭০
তৃতীয় পুরস্কার: ৳ ৪০-৫০

মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও *মাসিক আত-তাওহীদের* সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি।

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়।

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন।

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের কলম' ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক।

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত।

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে। তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য।

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে।

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা:

'প্রতিযোগিতা'
মাসিক আত্-তাওহীদ
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা)
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

সৌজন্যে
আল-মানার লাইব্রেরি
বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়।
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯

ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য

সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়। বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন। তিনি বর্তমানে **২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা–১২০৫, বাংলাদেশ** ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে।

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও সংস্থা তাঁকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তাঁর এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ডা. এম এম সরদার বলেন, 'আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। ক্যান্সার আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা– তাক্‌নাতূ মির্ রাহ্‌মাতিল্লাহ' অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ।'

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, 'একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন।'

ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয়।
মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪৭-৫০৫৯৫৫